স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ

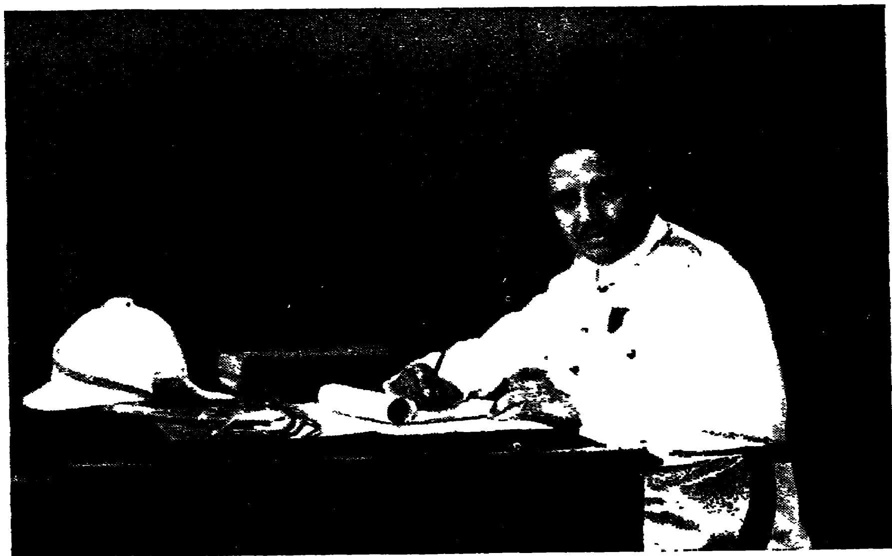
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সম্পাদিত

ফাল্গুন—১৩৩৯

মূল্য ১৲

প্রকাশক
প্রজাপতি-সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীঅহিভূষণ ঘোষ
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২১।এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা।



মান্যবর রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, কে, টি, এম,এল, সি,
এম,আর, এ,এস, এফ,আর, এস,এ, এফ,আর, সি,আই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সুযোগ্য

সভাপতি

প্রসিদ্ধ কর্ম্মী, সকল সৎকার্য্যে

উৎসাহী নেতা

আদর্শ ভূস্বামী

মাননীয় রাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে টি

মহোদয়কে বাঙ্গালীর গৌরব

স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের

পুণ্যজীবনকথা শ্রদ্ধাসহকারে

উৎসর্গ করিলাম

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার



Chunder M. Ghose

July 1906

স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ

জন্ম ও বংশ-বিবরণ

স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার ঘোলঘর গ্রামে ১২৪৫ সালের ১৫ই ফাল্গুন (ইং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেবের নাম রায় স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর এবং মাতৃদেবীর নাম স্বর্গীয়া চন্দনমালা।

রাজা আদিশূর বিরাট যজ্ঞ সমাধা করিবার জন্য যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে পঞ্চজন কায়স্থও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ অন্যতম। স্যর চন্দ্রমাধব এই মকরন্দ ঘোষেরই বংশধর।

বঙ্গদেশের ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কায়স্থগণ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা অন্ততঃ পক্ষে ক্ষত্রিয়ের সমতুল্য এবং সম্মানে ব্রাহ্মণেরই অব্যবহিত পরবর্ত্তী। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে ইতিবাস-বিশ্রুত যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই যজ্ঞ-সভায় কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয়ের আসনে উপবেশন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন।

বখতিয়ার খিলিজি পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ অধিকার করিলে পর লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুরে গমন করেন এবং প্রায় একশত বৎসর কাল তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ হিন্দুরাজ্যের এই অবশিষ্ট অংশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরে ইহাও মুসলমানগণের অধিকার-

ভুক্ত হয়। মুসলমানেরা বিক্রমপুর ধ্বংশ করেন এবং সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। যখন লক্ষ্মণ সেন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপ হইতে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত বহু সদ্ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারও বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে সকল উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারাও রাজার সহিত বিক্রমপুরে আগমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন ইঁহাদিগকে বিক্রমপুরের চতুষ্পার্শে ভূমি দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের সন্নিহিত অঞ্চলের উচ্চশ্রেণী কায়স্থগণকে আজও তথাকার সাধারণ লোকেরা ভুঁইয়া বলিয়া থাকে। বিক্রমপুরে হিন্দুরাজ্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবার সময়ে কায়স্থগণের কিয়দংশ চন্দ্রদ্বীপে পলায়ন করেন এবং ক্রমশঃ প্রবল পরক্রান্ত হইয়া উঠেন। উঁহারা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ গঠন করেন। কিন্তু ভাল ভাল কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবার বিক্রমপুরের উপকণ্ঠ বা সান্নিধ্য ত্যাগ করেন নাই। অবশ্য দারিদ্র্যে ও অভাবে ইঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী জলাভূমির মধ্যস্থিত গ্রামগুলিতে কয়েক ঘর ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ঘটকেরা বলেন, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষে পূর্ব্বপুরুষগণও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত; তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ হইতে এই অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপ ও বরিশালে ভাল কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল না। যেখানে ভাল কুলীন ব্রাহ্মণের বাস, তথায় ভাল ভাল কুলীন কায়স্থগণও থাকিতেন এবং ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাহাই ঘটুক না কেন, স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের পূর্ব্বপুরুষগণ ষোলঘরে আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ষোলঘর গ্রাম প্রাচীন দয়ালভোগ গ্রামের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধ দয়াল বা বিহারের নামে উৎসর্গীকৃত বলিয়াই এই গ্রামের নাম দয়ালভোগ হইয়াছিল। স্যর চন্দ্রমাধবের

পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; তথাপি সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে ভুঁইয়া নামে অভিহিত করিত।

পিতামহ ও পিতা

চন্দ্রমাধবের পিতামহের নাম গোবিন্দপ্রসাদ ঘোষ। তাঁহার ভাই ছিল না। তাঁহার অকালে মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি বিধবা পত্নী ও দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—হরপ্রসাদ ঘোষ ও দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। কনিষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান বালক ছিলেন। তিনি তাঁহার মাতার নয়ন-মণি ছিলেন। তিনি চরকায় সূতা কাটিয়া তল্লব্ধ অর্থে দুর্গাপ্রসাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ অল্প সময়ের মধ্যেই ফারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন এবং বরিশালের কালেক্টরীতে কর্ম্ম পান। তাঁহার কর্ম্মে যোগ্যতা, সাধুতা এবং অধ্যবসায় দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে চট্টগ্রামের সেরেস্তাদার-পদে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে দুর্গাপ্রসাদের সহিত বজ্রযোগিনীর প্রসিদ্ধ গুহ জমিদার-বংশীয় কমলাকান্ত গুহ মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হয়। বজ্রযোগিনী গ্রাম অত্যন্ত প্রাচীন এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহা অতীশের জন্মভূমি বলিয়া কথিত আছে। কমলাকান্ত একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার নাম গুরুপ্রসাদ গুহ। গুরুপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহার পিতৃব্য ও খুল্লতাত-পুত্রগণের বংশধরবৃন্দ ক্রমে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের নাম বিখ্যাত। কমলাকান্তের এক খুড়তুতো ভাইয়ের কন্যার সহিত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ও বাগ্মী মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষের পিতা রামগোপাল ঘোষের বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহাদের উভয়ের সহিত স্যর চন্দ্রমাধবের প্রভূত সদ্ভাব ছিল।

দুর্গাপ্রসাদের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটীই জ্যেষ্ঠা—তাঁহার নাম সত্যভামা; কনিষ্ঠটী পুত্র—নাম চন্দ্রমাধব ঘোষ। ইঁহারই জীবন-চরিত বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণিত হইতেছে। ষোলঘর গ্রামে দুইটী সন্তানই ভূমিষ্ঠ হয়েন। চন্দ্রমাধবের অন্নপ্রাশন হইয়া যাইবার পর তাঁহার পিতা দুর্গাপ্রসাদ স্ত্রীপুত্রকন্যাদিকে কর্ম্মস্থল চট্টগ্রামে লইয়া যান। কর্ম্মসূত্রে এখানে তিনি কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। আজও তাঁহার নাম তথাকার লোকে সসম্ভ্রমে স্মরণ করে। দুর্গাপ্রসাদ তেজস্বী ও অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি ছিলেন। সাধুতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। একবার চট্টগ্রামের কালেক্টর সাহেব দুর্গাপ্রসাদকে বলেন—তুমি ট্রেজারীর চাবি অপর একজন কর্ম্মচারীকে প্রদান কর। কি কারণে এরূপ আদেশ তাঁহাকে দেওয়া হয় তাহা কালেক্টরসাহেবই জানিতেন। কিন্তু কাছারীর নিয়ম-অনুসারে এরূপভাবে ট্রেজারীর চাবি দেওয়া অসঙ্গত ও অন্যায়। কাজেই তিনি তাঁহার উপরিওয়ালা কালেক্টর সাহেবের আদেশ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। এজন্য কালেক্টরসাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং সরকারে লিখিলেন—এরূপ অবাধ্য কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করা উচিত। কিন্তু বিভাগীয় কমিশনার মিষ্টার হার্ভে যখন এই ব্যাপারের আমূল তদন্ত করিলেন, তখন তিনি প্রীত হইয়া দুর্গাপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিয়া চব্বিশ পরগণার সদরে তথাকার বিভাগীয় কমিশনের পার্শন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট নিযুক্ত করিলেন। ফলে দুর্গাপ্রসাদ চট্টগ্রাম হইতে চব্বিশ পরগণার সদর আলিপুরে বদলী হইলেন। স্যর চন্দ্রমাধব যখন চট্টগ্রামে যান, তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর। এখানে তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। অতঃপর তাঁহার পিতা চব্বিশ পরগণার সদর আলিপুরে বদলী হয়েন।

শৈশব

চট্টগ্রামে থাকিবার সময়ে চন্দ্রমাধব একটি ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন এবং মধ্যে মধ্যে জিলা স্কুলটী দেখিয়া আসিতেন। তখন মিষ্টার ভৌহান চট্টগ্রাম জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি চন্দ্রমাধবকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। মিষ্টার ভৌহান কলিকাতার হিন্দু স্কুলে বদলী হয়েন এবং পরে চন্দ্রমাধব ভবানীপুরে আসিলে তিনি তাঁহার প্রিয় ছাত্র হইয়াছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ আলিপুরে বদলী হইয়া আসিয়া ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়ায় বাসা করেন। তাঁহার বাসা তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার বাবু রামচন্দ্র মিত্রের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিত ছিল। ইনিই হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের পিতা। শীঘ্রই উভয় পরিবারে সম্ভাব জন্মিল; সেই সদ্ভাব অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া উভয় পরিবারে এই সদ্ভাব চলিয়া আসিতেছে।

শিক্ষারম্ভ

চক্রবেড়িয়ার রামানন্দ মিত্রের বাড়ীতে একটী পাঠশালা ছিল; সেই পাঠশালায় প্রথমে চন্দ্রমাধবকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। চাউল-পটীতে কেশব মাষ্টার ও গৌরনারায়ণ বসু উভয়ে মিলিয়া একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন, সেখানে ইংরেজী শিখানো হইত। অতঃপর চন্দ্রমাধবকে এই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই গৌরনারায়ণ বসু মহাশয় অত্যন্ত বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং চন্দ্রমাধব তাঁহার বাল্যের এই শিক্ষাগুরুকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন।

দুর্গাপ্রসাদ প্রায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জমি জরিপ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্ধারণে সকল পক্ষই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেট্‌লমেণ্ট বা জরিপের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বহু স্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে মাসের পর মাস তাঁবুতেই কাটাইতে হইত। বারুইপুরে থাকিবার সময়ে তাঁহার সহিত তথাকার প্রসিদ্ধ চৌধুরী-পরিবারে কর্ত্তাদের অত্যন্ত পরিচয় হইয়াছিল। একজন কর্ত্তার নাম ছিল—নন্দবাবু। এখন চৌধুরী পরিবারের পুরাতন কর্ত্তারা সকলেই বোধ হয় পরলোকগত হইয়াছেন; এক্ষণে দুই পরিবারের বন্ধুতার কথা সম্ভবতঃ বিস্মৃতির গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গাপ্রসাদ যশোহরে বদলী হয়েন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ তারিখে চন্দ্রমাধবকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। দুর্গাপ্রসাদ চন্দ্রমাধবকে তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ও স্বগ্রামবাসী বাবু রামকানাই ঘোষের বাটীতে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। রামকানাইবাবু প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। রামকানাইবাবুর পুত্র কালীপ্রসন্ন ঘোষও চন্দ্রমাধবের সহিত একত্র হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নবাবু পরে ঢাকার সরকারী উকীল হইয়াছিলেন। ইহার অল্পদিন পরে রামকানাই বাবুর মৃত্যু হয়। দুর্গাপ্রসাদ তখন যশোহরে। রামকানাইবাবুর মৃত্যু হইলে দুর্গাপ্রসাদ ভবানীপুরে একটী বাটী লয়েন। তথায় কেবল চন্দ্রমাধব নহেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র পূর্ণচন্দ্র ঘোষও কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। অবশ্য দুর্গাপ্রসাদই তাঁহাদের সকলের অভিভাবক ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

বিবাহ

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নীলমাধবের সহিত যথাক্রমে শ্রীমতী হেমন্তকুমারী এবং শ্রীমতী সৌদামিনীর বিবাহ হয়। ইঁহারা উভয়েই প্রসিদ্ধ টাকির রায়চৌধুরী-বংশীয় কালীশঙ্কর রায়চৌধুরীর কন্যা। হেমন্তকুমারীর বয়স যখন ছয় এবং চন্দ্রমাধবের বয়স তখন এগার বৎসর মাত্র। একই বাড়ীতে একই সময়ে মহাসমারোহে দুইজনেরই বিবাহ হইয়াছিল; তবে বিবাহের স্থান অবশ্য স্বতন্ত্র ও পৃথক রাখিতে হইয়াছিল। কন্যাপক্ষ এই উপলক্ষে টাকি হইতে ভবানীপুরে আসিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিবাহ-ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবন

এই বিবাহের অল্পদিন পরেই চন্দ্রমাধবের ভগিনীপতি শ্রীনগরের বিখ্যাত কুলীন মুস্তফী পরিবারের রামকুমার গুহ মুস্তফীর মৃত্যু হয়। ইহাতে ঘোষ-পরিবারে শোকের গভীর ছায়া নিপতিত হয়। এইজন্য এই বিবাহকে অনেকে অমঙ্গলজনকও বলিয়াছিলেন। রামকুমার বাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন চন্দ্রমাধবের একমাত্র ভগিনী সত্যভামার বয়স মাত্র ১৪ বৎসর। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং পরিবারের কর্ত্রীরূপে দীর্ঘকাল জীবিতা ছিলেন। হিন্দুকলেজে চন্দ্রমাধবের দুইজন সহপাঠীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল; ইঁহাদের নাম—শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন। খিদিরপুরের বাবু মহিমচন্দ্র ঘোষ শ্রীশচন্দ্রের পিতা, এবং কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত নেতা ছিলেন। এই দুই সহপাঠীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হওয়ায় চন্দ্রমাধবের চরিত্র সুগঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রমাধবের অন্যান্য সহপাঠিগণের নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া এখানে উল্লিখিত হইল,— চণ্ডীচরণ বিশ্বাস, ইনি

কুক কোম্পানীর কেসিয়ার ছিলেন; কলিকাতার বাবু সাতকড়ি মিত্র; বলাইচাঁদ দত্ত; কালীকৃষ্ণ সেন, হাইকোর্টের উকীল; ইটলীর দেবেন্দ্র চন্দ্র বোস ও আনন্দগোপাল পালিত, ইঁহারাও হাইকোর্টের উকীল ছিলেন; হাটখোলা দত্ত-বংশের বাবু নবীনচাঁদ দত্ত ও দেবেন্দ্র চন্দ্র দত্ত; ভবানীপুরের রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র কাশীচন্দ্র মিত্র; প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র গিরিশচন্দ্র মিত্র ও উমেশচন্দ্র মিত্র; খিদিরপুরের বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রমাধবের বন্ধু ছিলেন। বিশেষতঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ সেন, কাশীচন্দ্র মিত্র ও গিরিশচন্দ্র মিত্রের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে যখন তাঁহার বিবাহ হয় সেই সময়ে তিনি কতকগুলি দুষ্ট ছেলের প্রভাবে পড়েন এবং মধ্যে মধ্যে কলেজ হইতে পলাইতে আরম্ভ করেন; কলেজে না আসিয়া ইনি মনুমেণ্ট, শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রভৃতি দেখিয়া বেড়াইতেন। অবশ্য ইহাতে তাঁহার নৈতিক চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই বটে কিন্তু পড়াশুনায় তিনি অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাবু রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র সহপাঠী চন্দ্রমাধবকে সাবধান করিয়া দেন এবং চন্দ্রমাধবের পিতাকে বলেন, চন্দ্রমাধবকে আমাদের সহিত সর্ব্বদা থাকিতে বলুন; সে যাহাতে আমার ছোট ভাই কাশীচন্দ্র প্রবোধচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র মিত্রের সহিত থাকে এমন আদেশ তাঁহার উপর করুন। চন্দ্রমাধব ইঁহাদের বাড়ীতে কয়েকমাস ছিলেন এবং ইঁহাদেরই ঘরের গাড়ী করিয়া ইঁহাদেরই সহিত কলেজে যাওয়া-আসা করিতেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে চন্দ্রমাধব দুষ্ট সঙ্গীদের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়েন। এইজন্য তিনি মিত্রবংশীয়দের নিকট কৃতজ্ঞ আছেন বলিয়া মনে করিতেন এবং উত্তর

কালে যখনই সুবিধা হইত তখনই এই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিতেন। কয়েকটী মামলায় চন্দ্রমাধব বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং মামলায় জয়লাভ করাইয়া দিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র মিত্র যখন প্রথম উকীল হইয়া হাইকোর্টে বাহির হন, সেই সময়ে চন্দ্রমাধব তাঁহাকে অল্পবিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। মোট কথা, মিত্র-বংশীয়দিগের বাড়ীতে থাকিবার সময় হইতেই চন্দ্রমাধবের জীবনের গতি নূতন পথে ধাবিত হইয়াছিল এবং তিনি শীঘ্রই কলেজের স্বশ্রেণীস্থ উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

চন্দ্রমাধব যখন হিন্দুকলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে চট্টগ্রাম স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার মিষ্টার ভোহ্লান মিষ্টার ভাইনিং এবং বাবু ঈশানচন্দ্র সাহা তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের পড়াশুনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। বিশেষতঃ ঈশানবাবু ছাত্রদের উন্নতির জন্য অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিতেন এবং ছাত্রেরা যাহাতে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা করে এবং নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে তাহাদিগকে সেইভাবে তৈয়ারী করিতেন। পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়া তাঁহার নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় কোন ছাত্রেরই ছিল না। ঈশানবাবুর নিকট নিয়মিত-ভাবে অধ্যয়নের যে অভ্যাস চন্দ্রমাধব আয়ত্ত করিয়াছিলেন সেই অভ্যাস তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে অত্যন্ত সুফলদায়ক হইয়াছিল। হিন্দু কলেজের নিম্নতর শ্রেণীতে জয়গোপাল শেঠ নামক একজন শিক্ষক ছিলেন, ইনিও ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে পাঠানুশীলনে রত করিবার জন্য অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করিতেন।

তখন শ্রীনাথ দাস মহাশয় হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তিভোগী ছাত্র ছিলেন, কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হইলে তাঁহার হইয়া শ্রীনাথবাবু মধ্যে মধ্যে

ক্লাসে পড়াইতে আসিতেন। ইনি অতঃপর সদর দেওয়ানী আদালত ও পরে হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চন্দ্রমাধব জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষা দিয়াই তিনি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে গমন করেন। সেখানে তাঁহার পিতা জমি-জরিপ-কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। তখন রেল হয় নাই; চন্দ্রমাধবকে পাল্কীতে চড়িয়া বিষ্ণুপুর গমন করিতে হইয়াছিল। তিনি পিতার নিকট দুইমাস ছিলেন। এই দুই মাসে তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তখন বিষ্ণুপুর অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় ফিরিবার পথে চন্দ্রমাধব বর্দ্ধমান পরিদর্শন করেন এবং তথাকার দেলখোস প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হন।

জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়ার পর চন্দ্রমাধব সদ্য-প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়েন, কিন্তু গণিত-শাস্ত্রে তিনি কি কাঁচা থাকায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় তাঁহার বৃত্তি কাটা যায়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চন্দ্রমাধবের পিতা চন্দ্রমাধবকে বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহাতপচাঁদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তদবধি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর চন্দ্রমাধবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

যথাসময়ে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ্ পরীক্ষা দেন কিন্তু বৃত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তখন মিষ্টার মন্ট্রিয়ো ও মিষ্টার বুলনোইস আইনের অধ্যাপক ছিলেন। এখানে আইন অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমাধব ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক মিষ্টার গ্রেফেলের শ্রেণীতেও

অধ্যয়ন করিতেন। এইজন্য ইংরাজী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অধিকার জন্মিয়াছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়নের সময়ে তাঁহার সহিত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কুঞ্জলাল মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। ভুবনচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে এবং কুঞ্জলাল কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে আসিয়াছিলেন। কুঞ্জলাল নদীয়া মুড়াগাছা প্রসিদ্ধ জমীদার দেবীদাস মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে এক্ষণে পরলোকগত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। চন্দ্রমাধব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময়ে তাঁহাকে গুরু পরিশ্রমের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে হইত। ইহার উপর তাঁহাকে আইনও পড়িতে হইত। এত পরিশ্রম তাঁহার সহ্য হইল না; স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; মুখ দিয়া রক্ত উঠিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার যে সঙ্কল্প ছিল তাহা ত্যাগ করিতে হইল। কিছুদিনের জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া সম্পূর্ণ বিশ্রামলাভের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি ভবানীপুর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে তাঁহার পিতামাতার নিকট গমন করেন; এখানে তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল তবে সুখের বিষয়, বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই এবং বঙ্গদেশে ইহা ঘটে নাই। কিন্তু সমগ্র ভারতে—বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই বিদ্রোহের জন্য জনসাধারণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিহার প্রদেশে এই বিদ্রোহ কিছুদিনের জন্য ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল এবং লোকে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এই বিদ্রোহের প্রতি একটুও সহানুভূতি ছিল না; তাই বিদ্রোহের

অবসান হইলে বাঙ্গালা দেশের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত-শাসনের যে অধিক'র ইংলণ্ডের রাজশক্তির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শেষ হয়। এই সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা-পত্রের প্রচার করেন তাহা ভারতবাসী অদ্যাবধি তাহাদের বিশিষ্ট অধিকার বলিয়া দাবী করিয়া থাকে।

চন্দ্রমাধবের প্রথম পুত্র বাঙ্গলা ১২৬৫ সালের ১৩ই আষাঢ় (ইংরেজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন) বৰ্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন ; উহার নাম ছিল জ্ঞানেন্দ্র। ছয় বৎসর বয়সে আমাশয়-রোগে ভবানীপুরে উহার মৃত্যু হয়।

বৰ্দ্ধমানে চন্দ্রমাধবের শরীর বেশ ভালই হইয়া উঠিয়াছিল। তথা হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় আইন-অধ্যয়নে ব্রতী হন, এই সময়ে তিনি বহুবাজারের নিকটবর্ত্তী গলঙ্গা লেনে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নীলমাধবের বাসায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই বাসায় নীলমাধবের শ্যালক অম্বিকা বসু ও কালীপ্রসন্ন ছিলেন। এই বাসায় থাকিবার সময়ে চন্দ্রমাধবের প্রথম শিক্ষাগুরু গৌরীসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। চন্দ্রমাধবের বন্ধু মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কালীকুমার মিত্র তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

আইন-শ্রেণীতে চন্দ্রমাধব বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে থাকেন। দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় যে অল্প কয়েক জন ছাত্রের কৃতিত্বের বিষয় আইনের প্রধান অধ্যাপক মন্টি্রয়ো সাহেব বিশেষভাবে তাঁহার রিপোর্টে

উল্লেখ করিয়াছেন, চন্দ্রমাধব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। মণ্ট্রিয়ো সাহেব চন্দ্রমাধবের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রমাধব আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কর্ম্মক্ষেত্রে

সদর আদালতের নিয়ম ছিল এই যে, কোনও ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মফস্বলের আদালত-সমূহে ওকালতী করিতে, মুন্সেফ-পদে নিযুক্ত হইতে এবং উর্দ্দ্ব্র একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে অধিকারী হইতেন।

চন্দ্রমাধব যখন আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন সেই সময় তাঁহার পিতা বর্দ্ধমানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। চন্দ্রমাধব ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর বর্দ্ধমানের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হন। সেই সময়ে মিষ্টার এইচ-এম রীড বর্দ্ধমানের জেলা-জজ ছিলেন। তিনি চন্দ্রমাধবের পিতার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন বলিয়া চন্দ্রমাধবের সহিত সর্ব্বদা ভদ্র ব্যবহার করিতেন ও তাঁহার প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। মিষ্টার এইচ-এস টমসন ছিলেন তথাকার সবজজ এবং মিষ্টার চার্লস হবহাউস (পরে মিষ্টার জাষ্টিস ও স্তর চার্লস হবহাউস) বর্দ্ধমানের কালেক্টর ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদ ইঁহারই অধীনে ডেপুটী কালেক্টর ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। রীড সাহেবের সহানুভূতি লাভ করিয়া চন্দ্রমাধবের কিছু কিছু মামলা জুটিত। রীড সাহেব দায়রার মামলায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে এসেসর হইতে বলিতেন। চন্দ্রমাধব দুইবার দায়রা আদালতে রীড সাহেবের এজলাসে পারিশ্রমিক না লইয়া আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই দুইটী মামলার একটীতে একজন আসামী খুনের দায়ে অভিযুক্ত

হইয়াছিল, চন্দ্রমাধব কর্ত্তৃক পক্ষ-সমর্থনের ফলে এই আসামী মুক্তি লাভ করে। প্রকাশ্য আদালতে রীড সাহেব এইজন্য চন্দ্রমাধবের প্রশংসা করেন সুতরাং ওকালতী প্রথমটা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুখেরই হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ রীড সাহেব শীঘ্রই বদলী হইয়া যান এবং তাঁহার স্থলে মিষ্টার সি টি বাকল্যাণ্ড বর্দ্ধমানের জেলা-জজ হইয়া আসেন। এই ভদ্রলোকের তাঁহার উপর মোটেই সহানুভূতি ছিল না, মাত্র তখনকার প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী মোহাম্মদ রহিমের উপর তিনি কিছু সন্তুষ্ট ছিলেন। চন্দ্রমাধব ইঁহার এজলাসে কচিৎ কোন মামলা পাইতেন। এদিকে মন্ট্রিয়ো সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সুপারিশ করেন তদনুসারে বাঙ্গালার লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার চন্দ্রমাধবকে বর্দ্ধমানের সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত করেন।

বাবু বংশীধর মল্লিক বর্দ্ধমানের সরকারীর উকীল ছিলেন; তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এই পদ খালি হয়। মন্ট্রিয়ো সাহেব লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার বোফোর্ট সাহেবের নিকট চন্দ্রমাধবের নাম মাত্র করিয়াছিলেন। বোফোর্ট সাহেব মন্ট্রিয়ো সাহেবকে বলেন, আপনি চন্দ্রমাধবকে আমার সহিত দেখা করিতে বলিবেন। তদনুসারে চন্দ্রমাধব বোফোর্ট সাহেবের সহিত দেখা করেন এবং বোফোর্ট সাহেব কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন যে, সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল-সরকার বাবু রমাপ্রসাদ রায় উক্ত আদালতের উকিল বাবু তারকনাথ সেনকে বর্দ্ধমানের উকীল-সরকারের পদের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ওকালতীতে আপনার অভিজ্ঞতা কিরূপ তাহা আমাকে বলুন। ইহার উত্তরে চন্দ্রমাধব বলেন,—আমি মাত্র পাঁচ ছয়টী মামলা করিয়াছি, তন্মধ্যে তিনটী মামলা জিতিয়াছি, তিনটী মামলা হারিয়াছি; ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। তিনি আরও বলেন—তারকনাথ আমা অপেক্ষা

প্রবীণ, তিনি সদর আদালতের উকীল এবং তাহার উপর বাবু রমাপ্রসাদ রায় তাঁহাকে সুপারিশ করিয়াছেন, সুতরাং আমার ভাগ্যে এই পদলাভ ঘটিবে না। বোফোর্ট সাহেব চন্দ্রমাধবের এই সত্য ও সরল উক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলেন—আমি আপনার ও তাঁরকনাথের নাম গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইব কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনি এই পদে নিযুক্ত হইবেন। সত্য সত্যই ঘটিয়াছিলও ইহাই।

এই সময়ে চন্দ্রমাধবের দ্বিতীয় পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র (নেপু) ১২৬৭ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে) তারিখে বর্দ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। যে বাড়ীতে তাঁহার জন্ম হয় তাহা বর্দ্ধমানের মহারাজার সম্পত্তিভুক্ত নটুগঞ্জে অবস্থিত এবং গোয়ালবাড়ী নামে বিখ্যাত। এই বাড়ীটী চন্দ্রমাধবের পিতা দুর্গাপ্রসাদ ভাড়া লইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের উকীল-সরকারের পদে নিযুক্ত হইবার পর চন্দ্রমাধব ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন সদর আদালতের উকীল-শ্রেণীভুক্ত হয়েন। সে সময় উর্দ্দুর পরীক্ষা উঠিয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে উহা দিতে হয় নাই।

বর্দ্ধমানের সরকারী উকীল নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই মিষ্টার বাকল্যাণ্ডের সহিত চন্দ্রমাধবকে সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কারণ বাঙ্গলা সরকার যে নিয়োগপত্র দিয়াছিলেন তাহা জেলা-জজ মিষ্টার বাকল্যাণ্ডের নিকটেই আছিয়াছিল। এই নিয়োগপত্র বাকল্যাণ্ড সাহেবের হস্তগত হইলে তিনি চন্দ্রমাধবকে ডাকিয়া পাঠান এবং প্রকাশ্য আদালতে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেমন করিয়া তিনি এই পদ লাভ করিয়াছেন। চন্দ্রমাধব উত্তরে বলেন, আমি এই পদের জন্য দরখাস্ত করি নাই, তবে বোফোর্ট সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং এই পদের জন্য আমাকে সুপারিশ করিয়াছিলেন। বাকল্যাণ্ড সাহেবের কিন্তু সন্দেহ হয় যে, দুর্গাপ্রসাদবাবু তাঁহার পুত্রের জন্য চেষ্টা করিয়া এই

কর্ম্মটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন। বাকল্যাণ্ড সাহেবের মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়াতেই তিনি চন্দ্রমাধবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বাকল্যাণ্ড সাহেবের সম্ভবতঃ এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, এই পদে মৌলবী জোহাদ রহিমকে নিযুক্ত করিলেই ভাল হইত। তাহা না হইয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, এই পদে একটী ছোকরাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তখন তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন এবং প্রকাশ্য আদালতে চীৎকার করিয়া বলেন, "সরকার বাহাদুর ইয়ে ছোকরাকো উকিল সরকার মোকরার কিয়া হৈ; সরকারকে কাম জাহান্নামমে যাওয়ে. ইয়ে সনদ্ উস কো দে দেও" ইহার অর্থ সরকার বাহাদুর একজন ছোকরাকে উকীল-সরকার করিয়াছেন, সরকারের কাজ জাহন্নমে যাউক। এই নিয়োগপত্র উহাকে দিয়া দাও। এই বলিয়া তিনি নিয়োগ পত্রখানি সেরেস্তাদারের টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। চন্দ্রমাধব বাকল্যাণ্ড সাহেবের এই ব্যবহারে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যান এবং নিয়োগপত্রখানি সেরেস্তাদারের নিকট হইতে লইয়া এজলাস-গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসেন।

কলিকাতায় গিয়া বোফোর্ট সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আসা হইতে পর পর যাহা ঘটিয়াছিল তিনি সে সমস্ত তাঁহার পিতার নিকট বলেন। তাঁহার পিতা সমস্ত শুনিয়া বলেন,—"এই পদ গ্রহণ করা ভাল হয় নাই। কারণ এই পদের কার্যভার অত্যন্ত গুরু ও কঠোর দায়িত্বপূর্ণ। তুমি এই পদে কার্য্য করিতে পারিবে না। তুমি এই কাজ ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু বর্দ্ধমানের অন্যান্য বন্ধুগণ, বিশেষতঃ সবজজ মিষ্টার টমসন বলেন,—'না, এ পদ তুমি ত্যাগ করও না। কারণ তোমার মত যুবকের পক্ষে ইহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিতে হইবে এবং তোমার কাজে আমি সাহায্য করিব। মিষ্টার টমসন চন্দ্রমাধবের পিতাকেও বলেন যে, তিনি যেন এ বিষয়ে আর আপত্তি না করেন।

অতঃপর দুর্গাপ্রসাদবাবু ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রমাধব বর্দ্ধমানের কলেক্টর মিষ্টার বার্চ্চের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। বার্চ্চ সাহেব বর্দ্ধমানে নূতন আসিয়াছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। চন্দ্রমাধব বার্চ্চ সাহেবকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"এ অবস্থায় কার্য্যে ইস্তফা দেওয়া উচিত কি না।" বার্চ্চ সাহেব কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া বলেন—"কাজে ইস্তফা দেওয়া উচিত নহে; আমি মিষ্টার বাকল্যাণ্ডকে এই বিষয় বলিব।" বলা বাহুল্য, বার্চ্চ সাহেবই চন্দ্রমাধবের সরাসরি উপরি-ওয়ালা। সুতরাং তিনি উকীল-সরকারের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। ভার লইয়া তিনি দেখিলেন যে, অন্যূন ১২০০ মামলা বর্দ্ধমানে বিচারাধীন রহিয়াছে এবং এই সব মামলায় গবর্ণমেণ্ট একটী পক্ষভুক্ত আছেন। ইহাতে তিনি ভীত হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। প্রায়ই তিনি ও তাঁহার পিতা রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত জাগিয়া মুসাবিদা তৈয়ারী, দরখাস্ত লেখা, লিখিত জবানবন্দী লেখা প্রভৃতি কার্য্য করিতে লাগিলেন। কার্য্য অবাধে চলিতে লাগিল। এই কার্য্য করিতে করিতে চন্দ্রমাধব ওকালতিতে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। কিন্তু আদালতের কার্য্য তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। সেই সময়ে সরকারী উকীলের কর্ত্তব্য ছিল—জেলা-জজের এজলাসে দায়রায় মামলা পরিচালনা করা। প্রথম দায়রা-মামলায় চন্দ্রমাধব সরকারী উকীল-রূপে মিষ্টার বাকল্যাণ্ডের এজলাসে হাজির হয়েন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাকল্যাণ্ড সাহেব বার্চ্চ সাহেবের নিকটে একখানি পত্র লিখেন। তিনি কি লিখিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানিতেন। একটু পরেই দেখা গেল—জোহাদ রহিম একটি পরওয়ানা লইয়া সরকার-পক্ষে উক্ত মামলা চালাইবার জন্য এজলাসে উপস্থিত হইলেন এবং চন্দ্রমাধব একরূপ অপমানিত হইয়াই এজলাস-গৃহ ত্যাগ করিলেন। তখন হইতে জোহাদ রহিম সকল

দায়রা-মামলায় সরকার-পক্ষে দাঁড়াইতে লাগিলেন। ইহার ফলে চন্দ্রমাধব আর বাকল্যাণ্ড সাহেবের এজলাসে দাঁড়াইতেন না। এই সময়ে সদর-আদালতের উকীলদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বনিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে উর্দ্দতে পরীক্ষা না দিলে সদর আদালতে উকীল হওয়া যাইত না, এক্ষণে সেই নিয়ম উঠিয়া গেল।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রমাধব মনে করিলেন, বর্দ্ধমান জেলা-আদালতে ওকালতী করিবার সনদ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল; তাহা ফিরাইয়া দিয়া বাকল্যাণ্ড সাহেবের এলাকা হইতে সরিয়া যাওয়াই ভাল। কারণ, ইহাতে তাঁহার ক্ষতির কারণ নাই, যেহেতু তিনি সদর আদালতে ওকালতী করিবার সনদ পাইয়াছেন। তদনুসারে তিনি বাঙ্গালায় একটী দরখাস্ত লিখিয়া উক্ত সনদ বাকল্যাণ্ড সাহেবের নিকট ফেরত দিলেন। সেরেস্তাদার এই দরখাস্ত তাঁহার নিকট পাঠ করিলে তিনি ভুল বুঝিয়া মনে করিলেন যে, চন্দ্রমাধব উকীল-সরকারের পদে ইস্তফা দিতেছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা হওয়ায় তিনি কতকটা বিচলিত হইয়া তাঁহার পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া যেন তাঁহার (বাকল্যাণ্ড সাহেবের) সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা উভয়েই বাকল্যাণ্ড সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উপবেশন না করিতেই বাকল্যাণ্ড সাহেব চন্দ্রমাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কেন উকীল-সরকারের পদে ইস্তফা দিতেছেন এবং আমার এজলাসে হাজির হইতেছেন না?" চন্দ্রমাধব নিরুত্তর রহিলেন। তখন বাকল্যাণ্ড সাহেব গরম হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হাম কুত্তা হৈ? হাম কৈকো কাটা হৈ?" তোম হামারা পাশ কাহে হাজির হোতা নহি হৈ?" ইহার অর্থ—"আমি কি কুকুর? আমি কি কামড়াই? তাই তুমি আমার এজলাসে হাজির হও না?"

চন্দ্রমাধব নবীন বয়সে বড়ই স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং সে সময়ে তাঁহাকে কেহ কোন কথা বলিলে তিনি তাহার উচিতমত জবাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। তিনি বাকল্যাণ্ড সাহেবের ঐ কথার উত্তরে বলিলেন,—"অগর হুজুর কুত্তা হোতা হৈ উস্‌কো ইলাজ রয়তা, মগর আব যো কাটে হৈ উস্‌কো ইলাজ নহি হৈ।" ইহার অর্থ—আপনি যদি কুকুর হইতেন তাহা হইলে তাহার কামড়ের ঔষধ থাকিত; কিন্তু আপনার কামড়ের ঔষধ নাই।

চন্দ্রমাধবের পিতা পুত্রের এই কথায় অত্যন্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়েন; কিন্তু মিষ্টার বাকল্যাণ্ড এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কিরূপে তোমার ক্ষতি করিয়াছি?" চন্দ্রমাধব বলিলেন,—"পূর্ব্বে আমি দুই একটি মামলা পাইতাম, কিন্তু আপনি আমার সহিত উক্ত প্রকার ব্যবহার করাতে কেহ আমাকে মামলা দেয় না।" ইহাতে বাকল্যাণ্ড সাহেব চন্দ্রমাধবের পিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আপনার পুত্র বলিতেছে আমি উহার ক্ষতি করিয়াছি; বেশ আমি তাহা পূরণ করিয়া দিব।" অতঃপর পিতা-পুত্রে বাকল্যাণ্ড সাহেবের নিকট হইতে চলিয়া আসেন।

চন্দ্রমাধব বাকল্যাণ্ড সাহেবের সহিত অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন এবং বলেন, "উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদের সহিত এভাবে কথা-বার্ত্তা কহা উচিত নয়।" চন্দ্রমাধব ইহার উত্তরে বলেন,—"আমি এরূপ রূঢ়ভাবে উত্তর না দিয়া থাকিতে পারি নাই; কারণ, বাকল্যাণ্ড সাহেব নিজের ব্যবহার দ্বারাই এরূপ উত্তর দিতে আমাকে প্ররোচিত করিয়াছেন।" প্রাতঃকালে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার পিতা এই বলিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন, "যদি তুমি এরূপ আচরণ

কর, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তোমার ভাল হইবে না এবং একদিন না একদিন ইহার কুফল ভোগ করিতে হইবে।" ইহাতে চন্দ্রমাধব উত্তর করেন,—"আপনার আশীর্ব্বাদে আমার কোনও অমঙ্গল হইবে না।"

ঐ দিনই বেলা ১টার সময় বাকল্যাণ্ড সাহেব চন্দ্রমাধবকে তাঁহার এজলাসে ডাকিয়া পাঠান এবং তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"কাল আপনার শরীর ভাল ছিল না; সেইজন্ত তাড়াতাড়ি আদালত হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, আজ আপনি কেমন আছেন?" বাকল্যাণ্ড সাহেবের এই কথায় চন্দ্রমাধব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন; কারণ তাঁহার শরীর অসুস্থও হয় নাই এবং বাকল্যাণ্ড সাহেবও এ বিষয়ে কিছুই শুনেন নাই। সুতরাং বাকল্যাণ্ড সাহেবের এ কথায় তিনি কি বলিবেন তাহা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, "হুজুরের কৃপায় ভালই আছি"। যাহা হউক এই উত্তরে সকল দিকই রক্ষা পাইল। বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার কথার উত্তরে বলিলেন—"আচ্ছা বেশ; আজ আমার এজলাসে আপনার কোন কাজ আছে?" চন্দ্রমাধব উত্তর করিলেন,—"না"। ইহাতে বাকল্যাণ্ড সাহেব বলিলেন,—"আচ্ছা তবে আপনি যাইতে পারেন; আপনার অন্য যে কাজ আছে তাহা করুন।"

অতঃপর চন্দ্রমাধব এজলাস হইতে চলিয়া আসিলেন। তখন বহুলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি? বাকল্যাণ্ড সাহেব এরূপ বদলাইয়া গেলেন কেন?" চন্দ্রমাধব বিস্তৃতভাবে কোন কথা না বলিয়া মাত্র বলিলেন—"বাকল্যাণ্ড সাহেবকে আমি কিছু ঔষধ দিয়াছি।"

বাকল্যাণ্ড সাহেবের বাড়ীতে যখন চন্দ্রমাধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন তখন বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহাকে

বলিয়াছিলেন—"তুমি এখনও অভিজ্ঞতা লাভ কর নাই, এ অবস্থায় জোহাদ রহিমই দায়রার মামলাগুলি চালাইবেন, তুমি তাঁহার সহিত দাঁড়াইও এবং কাজকর্ম্ম শিখিও।" বলা বাহুল্য, চন্দ্রমাধব তাঁহার এই আদেশ পালন করেন এবং জোহাদ রহিমের সহিত দায়রার মামলায় দাঁড়াইতে থাকেন।

একবার এইরূপ একটী ঘটনা ঘটে—দায়রার একটী মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যারিষ্টার রীড্ সাহেব আসেন; জোহাদ রহিম সরকার-পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারে আসামীর দণ্ড হয়। বাকল্যাণ্ড সাহেব কলেক্টরের নিকট এই মর্ম্মে এক চিঠি লিখেন যে, এই মামলার জন্য জোহাদ রহিমকে দুইশত টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হউক। তদনুসারে কলেক্টর সাহেব লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার বোফোর্ট সাহেবের নিকট উক্ত বিল মঞ্জুরীর জন্য পাঠাইয়া দেন।

বলা বাহুল্য, চন্দ্রমাধব ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় গিয়া মণ্ট্রিয়ো সাহেব ও বোফোর্ট সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং উকীল-সরকারের নিয়োগপত্র তাঁহার হস্তে দিবার সময় বাকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ও দায়রার মামলাগুলির পরিচালন-সম্বন্ধীয় বিষয় তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব এই বিষয় চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর স্কন্স সাহেবকেও বলেন। তিনি তখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার জনৈক সদস্য। ইঁহারই অধীনে চন্দ্রমাধবের পিতা কিছুদিন ডেপুটী কলেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই চন্দ্রমাধবের মুখে উক্ত ব্যাপার শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে বলেন যে, তিনি সহিষ্ণুতার সহিত কাজ করিয়া যান, শেষে সমস্ত বিভ্রাট ঘুচিয়া যাইবে।

যখন জোহাদ রহিম-সম্পর্কিত উক্ত বিলখানি বোফোর্ট সাহেবের নিকট পৌঁছে তখন তিনি এইরূপ মন্তব্য লিখিয়া তাহা কলেক্টরের

নিকট ফেরত পাঠান যে, এই মামলায় উকীল-সরকারকে দাঁড়াইতে বলিলেই হইত; আর একজন উকীলকে নিযুক্ত করিবার কোনও কারণ দেখি না; পারিশ্রমিক উকীল-সরকার অর্থাৎ চন্দ্রমাধবকেই দেওয়া উচিত। কলেক্টর বার্চ্চ সাহেব বোফোর্ট সাহেবের এই মন্তব্য গোপনে বাকল্যাণ্ড সাহেবকে জানাইলেন; ব্যাপার বুঝিয়া বাকল্যাণ্ড সাহেবের চক্ষু স্থির হইয়া গেল। যাহা হউক, এই ব্যাপারের মীমাংসা এইভাবে হইল—উকীল-সরকার চন্দ্রমাধববাবু এই দুইশত টাকা পারিশ্রমিকের দাবী ছাড়িয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে সকল দায়রা-মামলায় সরকার-পক্ষে তিনি নিযুক্ত হইলেন। কলেক্টর বার্চ্চ সাহেব এই মীমাংসার বিষয় চন্দ্রমাধবকে লিখিয়া জানাইলেন। উত্তরে চন্দ্রমাধব লিখিলেন যে, তিনি বোফোর্ট সাহেবকে উক্ত পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন কথা জানান নাই, সুতরাং উক্ত পারিশ্রমিকের উপর তাঁহার কোনও দাবী নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বোফোর্ট সাহেবকেও এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, দায়রা-মামলায় সরকার-পক্ষ সমর্থনের জন্য এখন হইতে তিনিই দাঁড়াইবেন এবং ঐ দুই শত টাকা পারিশ্রমিকের উপর তাঁহার কোন দাবী নাই।

ইহার অব্যবহিত পরেই বাকল্যাণ্ড সাহেবের এজলাসে তিনটী দেওয়ানী মামলা রুজু হয়। তিনটী মামলাতেই গভর্ণমেণ্ট একটী পক্ষভুক্ত ছিলেন। মামলা তিনটীতে সরকার-পক্ষে চন্দ্রমাধব এবং অপর পক্ষে জোহাদ রহিম দণ্ডায়মান হন। তিনটী মামলাই খুব জোর চলিয়াছিল এবং চন্দ্রমাধব সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ ও সওয়াল জবাব হিন্দুস্থানী ভাষায় করিয়াছিলেন। এই তিনটী মামলার মধ্যে একটী মামলায় গভর্ণমেণ্ট হারিয়াছিলেন এবং দুইটী মামলায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। মকদ্দমা তিনটী শেষ হইলে জজ বাকল্যাণ্ড সাহেব প্রকাশ্য আদালতে চন্দ্রমাধবকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"আপনি এই

তিনটী মামলায় চমৎকার সওয়াল জবাব করিয়াছেন, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি যে একটী মামলায় হারিয়াছেন সেজন্য আপনার কোন দোষ নাই।" ইহার ফল এই হইল যে, মামলাকারীগণ বাকল্যাণ্ড সাহেবের এজলাসে চন্দ্রমাধবকে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বাকল্যাণ্ড সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়া বদলী হইলেন, বদলী হইবার পূর্ব্বে তিনি সরকারী খাতায় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া যায়েন যে, উকীল সরকার বাবু সি-এম ঘোষ অত্যন্ত যোগ্য যুবক, কেবল ইঁহার অভিজ্ঞতার অভাব (Babu C. M. Ghose, Government Pleader, is a very able youngman, only wanting in experience.)। সবজজ টমসন সাহেবের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তিনি চন্দ্রমাধব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই, "আমি ইহার উপর অবিচার করিতেছিলাম. আমার ধারণা ছিল—ইনি "ইয়ং বেঙ্গল" (Young Bengal) দলভুক্ত, সুতরাং প্রকৃত যোগ্যতা কিছু নাই। এখন দেখিতেছি ইনি উহার বিপরীত। যাহা হইয়া গিয়াছে সে জন্য আমি দুঃখিত। যদি ভগবান ইঁহাকে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে ইনি পরে বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবেন।"

বাকল্যাণ্ড সাহেবের পদে যিনি আসেন তাঁহার নাম ছিল - মিষ্টার পিয়ার্স টেলর। ইনি বয়সে প্রবীণ ছিলেন বটে, তবে যোগ্যতা তেমন ছিল না; কিন্তু ইনি সরল, সদুদ্দেশ্যসম্পন্ন, অকপট, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন; তবে মধ্যে মধ্যে উগ্রমূর্ত্তি ধরিতেন। চন্দ্রমাধব ইঁহার সহিত একরূপ ভালই কাটাইয়াছিলেন।

এই সময়ে চন্দ্রমাধবের পিতা নদীয়া জেলায় বদলী হয়েন। নীলকর-বিভ্রাট-সম্পর্কে বহু বাকী খাজনার মামলা রুজু হইয়াছিল; এইগুলির বিচারের জন্য তাঁহাকে নদীয়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হইয়াছিল।

চন্দ্রমাধব যখন বৰ্দ্ধমানে ওকালতী করিতেছিলেন সেই সময়ে ভবানীপুরের রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বৰ্দ্ধমানের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। শীঘ্রই ইঁহাদের দুইজনের অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মে এবং সেই বন্ধুত্ব আজীবন বৰ্ত্তমান ছিল। রাখালবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক্ষণে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অধীনে একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট চন্দ্রমাধবের বন্ধু খিদিরপুর-নিবাসী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, তাঁহাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই ঘটনায় তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল ; সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন-বিয়োগে যেরূপ ব্যথা লাগে সেইরূপ ব্যথা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

অতঃপর তাঁহার পিতাকে নদীয়া হইতে খুলনা জেলায় বদলী করা হয়। এখানে জমি-জরীপ-কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন খুলনার মহকুমা-হাকিম ছিলেন। যে বঙ্কিমবাবু বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে দিক্‌পাল ছিলেন, ইনি তিনিই। প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের ক্লাসে তিনি চন্দ্রমাধবের সহাধ্যায়ী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ উপাধিধারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে বি-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে ইঁহারা দুইজনেই বি-এ পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উত্তীর্ণ হয়েন। ইঁহারা দুইজনেই চন্দ্রমাধবের সহপাঠী ছিলেন। চন্দ্রমাধব যে বৎসর এণ্টান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন ইঁহারা দুইজনও সেই বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ; তবে সৌভাগ্যবশতঃ ইঁহারা বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার আর বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই ; তিনি কেবল আইনের পরীক্ষাই দিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ উভয়েই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন।

প্রায় এই সময় কলেক্টর বার্চ্চ সাহেব বর্দ্ধমান হইতে হুগলীতে বদলি হইলেন। হুগলীতে তাঁহাকে অতিরিক্ত দায়রা-জজের পদে বহাল করা হইল। বর্দ্ধমানে তাঁহার স্থলে মিষ্টার ষ্টুয়ার্ট হগ (পরে স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ) কলেক্টর হইয়া আসিলেন। ইনি পূর্ব্বে পশ্চিম অঞ্চলের কোথাও ছিলেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন তখন সিপাহী বিদ্রোহের সময়। এইজন্য তিনি জবরদস্তিতে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াই বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন।

তিনি কলেক্টরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কাছারীতে বসিবার কয়েকদিন পরেই চন্দ্রমাধব তাঁহার নিকট সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিলেন; বলা বাহুল্য, তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি তিনি দিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা উল্লেখ-যোগ্য। যখন চন্দ্রমাধব হগ সাহেবের গৃহে প্রবেশ করেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, হগ সাহেব একটি উচ্চ টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে বসিতে বলিলেন না, বরং ২।৩ বার তাঁহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"উকীল-সরকার হ্যায়?" চন্দ্রমাধব উত্তর করিলেন—"খোদাবন্দ"। তার পর আবার প্রশ্ন হইল—"উকীল সরকার হ্যায়; কুচ আর্জ্জি হ্যায়?" অর্থাৎ তুমি সরকারী উকীল, আমার নিকট তোমার কিছু প্রার্থনা আছে? চন্দ্রমাধব ইহার উত্তরে হিন্দীতে বলিলেন,—"আমার কোনও প্রার্থনা নাই; যেহেতু আপনি নূতন কলেক্টর হইয়া আসিয়াছেন সেই হেতু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়াই হগ সাহেব গরম হইয়া বলিলেন— "তুমি আমার

সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।" চন্দ্রমাধব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কতকটা হতভম্ব হইয়াই চলিয়া আসিলেন। তখনই তাঁহার ধারণা হইল,—যে উপরিওয়ালার গোড়াতেই এইরূপ ব্যবহার তাঁহার সহিত কাজ করা সুবিধাজনক হইবে না।

কিছুদিন পরে একটী সুযোগও উপস্থিত হইল; তাহাতে তিনি হগ সাহেবের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। সেই সময়ে বর্দ্ধমানে বিস্তর মামলা (Resumption Suits) বিচারাধীন ছিল; বহুদিন ধরিয়া মামলাগুলির বিচার হইতেছিল না। এইসকল মামলার বিচার শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট বর্দ্ধমানে ৪জন ডেপুটী-কলেক্টর নিয়োগ করিবার বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব ইহা জানিতে পারিয়া বার্চ্চ সাহেবকে হুগলীতে লিখিলেন—"আমি ডেপুটী-কলেক্টরীর জন্য দরখাস্ত করিতে চাই; আপনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিষ্টার জর্জ্জ প্লাউডেনের নিকট আমাকে সুপারিশ করুন।" বার্চ্চ সাহেব অবশ্য চন্দ্রমাধবের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ গবর্মেণ্ট বর্দ্ধমানে ডেপুটী-কলেক্টর নিযুক্ত করেন নাই; তবে তাঁহারা চন্দ্রমাধবকে বাখরগঞ্জে অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ হইল।

চন্দ্রমাধব এই নিয়োগপত্র পাইবামাত্র হগ সাহেবকে লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে উকীল-সরকারের পদ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হউক। হগ সাহেব তাঁহাকে লিখিলেন—"আপনি বর্দ্ধমানের উকীল মতিলাল চৌধুরীকে আপনার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিন।" এই মতিবাবু চন্দ্রমাধবের সহপাঠী ছিলেন। তদনুসারে চন্দ্রমাধব মতিবাবুকে কাজকর্ম্ম সমস্তই বুঝাইয়া দিয়া নূতন কর্ম্মস্থল বাখরগঞ্জে

যাইবার উদ্যোগ-আয়োজন করিবার জন্য কলিকাতায় গমন করিলেন। এদিকে পর পর তিনটী মামলা বিচারাধীন ছিল—সেগুলিতে গবর্মেণ্ট প্রতিবাদী ছিলেন। দুইটী মামলা নূতন সবজজ রাইট সাহেবের এজলাসে ছিল (টমসন সাহেব তখন বদলি হইয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন); অপরটী বীরভূমের আদালতে। শেষোক্ত মামলাটীর কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সমস্ত বৰ্দ্ধমানে ছিল। চন্দ্রমাধবকে এই তিনটী মামলার লিখিত জবানবন্দী তৈয়ারী করিতে বলা হয়। তিনটী মামলারই লিখিত জবানবন্দীর মুসাবিদা করিতে এবং ঐগুলি কলেক্টর ও অন্যান্য উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারীদিগকে দেখাইয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে এই অবস্থা ঘটিল যে, চন্দ্রমাধবকে বাধ্য হইয়া কলেক্টর সাহেবের নিকট অনুরোধ করিতে হইল যে, যেহেতু মামলার আর সময় নাই, সেই হেতু তিনিই আমার এই লিখিত জবানবন্দীর মুসাবিদাগুলি মঞ্জুর করুন; ঐগুলি কমিশনার ও লিগ্যাল রিমেমব্রান্সারের নিকট চরম অনুমোদনের জন্য না পাঠাইয়া এইগুলি আদালতে পেশ করিবার বিশেষ অনুমতি তিনি প্রদান করুন। নহিলে মামলার তারিখে ঐগুলি পেশ করা হইবে না। তিনটী মামলার জবানবন্দীর মুসাবিদাই হগ সাহেবের হস্তে আসিল। বীরভূম আদালতে বিচারাধীন মামলাটী অত্যন্ত জটিল ছিল। যখন এই মামলার লিখিত জবানবন্দীর মুসবিদা ও অন্যান্য কাগজপত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইল, তখন তিনি সেগুলি বুঝিতে পারিলেন না। কতকগুলি কাগজপত্র আবার কলেক্টরী আফিসের জনৈক কেরাণী ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি তখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। যাহা হউক, কলিকাতা হইতে ফিরিয়াই তিনি হগ সাহেবের সহিত

সাক্ষাৎ করিলেন। বৰ্দ্ধমানে তাঁহার অনুপস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার সহিত হগ সাহেবের বিস্তর কথা-কাটাকাটি হইল। অতঃপর হগ সাহেব বলিলেন—"আপনি যে লিখিত জবানবন্দী তৈয়ারী করিয়াছেন তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" ইহার উত্তরে চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন, "মামলাটী বড়ই জটিল এবং আপনার আফিস হইতে যে অনুবাদ হইয়াছে উহাও ভাল নহে। যদি আপনাকে আমি মামলাটী আগাগোড়া বুঝাইয়া না দিই, তাহা হইলে আপনি ইহা বুঝিতে পারিবেন না।" তার পর চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন,—"আমি অনুবাদের দোষ সংশোধন করিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।" তৎপরদিনই তিনি হগ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত মামলাটি বুঝাইয়া দেন। তখন তিনি লিখিত জবানবন্দী বুঝিতে পারেন এবং উহা সরাসরি পেশ করিবার অনুমতি দেন।

অতঃপর চন্দ্রমাধব বাবু হগ সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়গ্রহণকালে তিনি বলেন,—"আমি আগামী কল্যই বৰ্দ্ধমান হইতে চলিয়া যাইতেছি। আপনার সহিত আমার বনিবনাও হয় নাই,—এজন্য আমি দুঃখিত।" পরে চন্দ্রমাধব বাবু জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হগ সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি 'বদমাস' অর্থাৎ দুষ্ট লোক।

বৰ্দ্ধমান-ত্যাগ ও নূতন কৰ্ম্মে যোগদান

তিনি মাতা, স্ত্রী, শ্যালিকা ও দুই পুত্রসহ বৰ্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে নৌকা-যোগে নূতন কৰ্ম্মস্থল বরিশাল যাত্রা করিলেন। খুলনার উপর দিয়া বরিশালের পথ। পূৰ্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন খুলনার মহকুমা-হাকিম এবং তিনি চন্দ্রমাধবের সহাধ্যায়ী।

যেদিন অপরাহ্ণে চন্দ্রমাধব খুলনায় পৌছেন সেই দিন অপরাহ্ণেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহার ইহা জানা ছিল না যে, মহকুমা-হাকিমের বাসা বন্দুকধারী সিপাহীরা পাহারা দেয়। সুতরাং তিনি বঙ্কিমবাবুর বাসার নিকটবর্ত্তী হইতেই সিপাহীরা তাঁহার পথ রোধ করে ও সাঙ্কেতিক বাক্যে তিনি শত্রু কি মিত্র জিজ্ঞাসা করে। চন্দ্রমাধবের এ অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে ছিল না। তিনি সিপাহীদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন নাই। কাজেই সিপাহীরা কোনও অনর্থ ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, সেই সময় বঙ্কিমবাবুর একটী ভৃত্য তথায় উপস্থিত হয় এবং তাহাতে বিভ্রাটের অবসান হয়। পরে তিনি সিপাহীদের নিয়ম জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহারা আগন্তুককে তিনবার প্রশ্ন করে; কিন্তু তিনবারই যদি কোনও উত্তর না পায়, তখন উহাকে গুলি করে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে তিনি বরিশালে উপস্থিত হইয়া নূতন পদে যোগদান করেন। তখন হার্ভে সাহেব বাখরগঞ্জের কলেক্টর এবং বাবু অভয়চরণ বসু প্রধান ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। অভয়বাবুকে চন্দ্রমাধব বাবু পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তাঁহারা উভয়েই চন্দ্রমাধব বাবুকে সাদরে গ্রহণ করেন। যাহা হউক, তিনি বরিশালে আসিয়া তাঁহার নূতন কর্ম্মে ব্রতী হইলেন। তাঁহার উপর কয়েকটী জটিল খাজনা-সংক্রান্ত মামলার বিচার-ভার পড়িল। চন্দ্রমাধব বর্দ্ধমানে উকীল-সরকারের কার্য্যে মাসে প্রায় ২০০৲* টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তখন বর্দ্ধমানের বড় বড় উকীলের পারিশ্রমিকও অত্যন্ত কম ছিল। সেইজন্য তিনি বর্দ্ধমানে সাধারণের দেওয়ানী মামলা লইতেন না; কেবল সরকারী মামলাই তিনি করিতেন। তিনি কিছুদিন ধরিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, কারণ তখনকারকালে ইহা অপেক্ষা উচ্চপদ ভারতবাসীর

আকাঙ্ক্ষা করিতে পারিত না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ডেপুটী কলেক্টর হইলে পরে তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইবে। কয়েকটী জেলায় কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী, ডেপুটী কলেক্টরী করিলে মামলা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিবে এবং ঐ সকল জেলায় তিনি প্রসিদ্ধিলাভও করিবেন। তার পর যদি ডেপুটী কলেক্টরী তাঁহার না পোষায়, তাহা হইলে উহা ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিবেন। এইরূপ বিচার-বিবেচনা এবং হগ সাহেবের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভই তাঁহার বাখরগঞ্জে অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদগ্রহণের কারণ।

বাখরগঞ্জে অবস্থান করিবার সময়ে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পরিচয় হয়; ইনি ভাওয়াল-রাজের ম্যানেজার ছিলেন এবং পরে রায় বাহাদুর ও সি-আই-ই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও বঙ্গসাহিত্যসেবী ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বাখরগঞ্জের সদর বরিশালে থাকিবার সময়ে কালীমোহন দাস মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়; তিনি তখন বরিশালের উকীল-সরকার ছিলেন। কালীমোহন বাবু কলেজে চন্দ্রমাধব বাবু অপেক্ষা এক ক্লাস নীচে পড়িতেন।

বাখরগঞ্জে কার্য্যে যোগদান করিবার কয়েকদিন পরেই দুর্গাপূজার ছুটী হইল। সেই সময় তথায় চন্দ্রমাধব বাবুর যে কয়েকজন স্বগ্রামবাসী ছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন—পূজার ছুটী পাইয়াছেন যোলঘরে গিয়া বিশ্রাম করিয়া আসুন; চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাদের কথামত হরকুমার মুস্তফীর সহিত যোলঘরে গমন করেন; পথে নৌকা-ভ্রমণ অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছিল। চন্দ্রমাধব বাবু যোলঘরে উপস্থিত হইলে তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন; কারণ তখনকার দিনে এই পদই ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চতম পদ ছিল।

কয়েকদিন ঘোলঘরে থাকিয়া তিনি হরকুমারের সহিত পুনরায় বরিশাল যাত্রা করেন। ঘোলঘর যাতায়াতের পথে দুই বা তিনটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রথম ঘটনাটি এই—ঘোলঘর যাইবার পথে যখন তাঁহাদের নৌকা পদ্মার কুলে উপস্থিত হইল তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; তথা হইতে পদ্মা পার হইলে তবে বিক্রমপুরে পৌছিতে পারা যাইবে, সন্ধ্যা আসন্নপ্রায় দেখিয়া মাঝিরা নঙ্গর ফেলিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, কারণ রাত্রিতে প্রায়ই কেহ পদ্মা পার হইতে সাহস করে না। বিশেষতঃ সেদিন রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকারময়ী ছিল। চন্দ্রমাধব ঘোলঘরে যাইবার জন্য এতই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি মাঝিদের বলিলেন,—"তোমরা নঙ্গর ফেলিও না, নৌকা ওপারে লইয়া চল।" যে মাঝি নৌকার হাল ধরিয়াছিল তাহাকে দাঁড় ধরিতে বলিলেন। নৌকায় দুইজন দাঁড়ি ছিল ইহাকে লইয়া তিনজন। চন্দ্রমাধব স্বয়ং হাল ধরিলেন এবং হাল যাহাতে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারা যায় সে জন্য তাঁহার ভৃত্যকেও তাহার সঙ্গে লইলেন। তাঁহার এই ভৃত্যটী অত্যন্ত বলশালী ছিল, যাহা হউক নৌকা বড় বড় ঢেউ কাটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং পাঁচ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর নৌকা পরপারে উপনীত হইল। জীবনের এই সময়ে চন্দ্রমাধব অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন এবং বিপদকে গ্রাহ্যই করিতেন না। এই ঘটনার কথা যখন চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠতাত হরকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় শুনিলেন তখন তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন এবং চন্দ্রমাধবের এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যের নিন্দা করেন। আর একটী ঘটনা ঘোলঘর হইতে বরিশাল ফিরিবার পথে ঘটিয়াছিল; সে ঘটনাটী এই—বেলা প্রায় বারটার সময় তিনি তাঁহার বন্দুকে কিছু বারুদ ও গুলি পূরিয়া পদ্মার বক্ষে ভাসমান কতকগুলি জলচর পক্ষীর দিকে বন্দুক চালনা করেন, কিন্তু গুলি ছুটিল না। আবার তিনি চেষ্টা করিলেন তথনও গুলি চলিল না, ইহাতে

তিনি বিস্মিত হইয়া বন্দুকটী পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা কালে দেখিলেন যে, বন্দুকটি আগাগোড়া ঠাসা রহিয়াছে। তখন তিনি এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন যে, যদি এত অধিক পরিমাণ বারুদ জ্বলিয়া উঠিত, তাহা হইলে বন্দুকটী ত ফাটিয়া যাইতই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও প্রাণ যাইত। ষোলঘরে থাকিবার সময়ে কে এভাবে বন্দুকটি ঠাসিয়া রাখিয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন না। তৃতীয় ঘটনাটি ঐ দিন অপরাহ্নে—বেলা প্রায় পাঁচটার সময়ে ঘটিয়াছিল। তাঁহার নৌকা বাখরগঞ্জ জেলার লক্ষ্মীরচরের সম্মুখে নঙ্গর করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে একটী বড় নদী ছিল উহা তাঁহাদিগকে পার হইতে হইবে। চন্দ্রমাধব মনে করিলেন, তিনি যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন এই গ্রামটী পরিদর্শন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার হিন্দুস্থানী চাপরাশী গুরুদয়াল, একটী ভৃত্য ও বন্দুক লইয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং তথাকার অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানকার জমিদার কে? তিনি প্রজাদের সহিত কেমন ব্যবহার করেন, এবং ধান-চাউলের অবস্থা কেমন ইত্যাদি। তাঁহার এই সকল প্রশ্নের উত্তর যে গ্রামবাসীরা কিছু কিছু না দিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল যে, চন্দ্রমাধব প্রকৃত হাকিম নহেন, জাল হাকিম এবং ডাকাত। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বলে যে, আপনি এই গ্রামে দাঁড়াইবেন না, এখনি আপনার নৌকা করিয়া এই গ্রাম হইতে চলিয়া যান। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিবার জন্য অর্থাৎ তিনি যে কে তাহা বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই; কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। কিন্তু নৌকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক মুসলমান লাঠি হাতে করিয়া মার মার শব্দে তাঁহাকে তাড়া করিল। চন্দ্রমাধব বাবু সত্বর নৌকার ভিতর প্রবেশ করেন এবং বন্দুকটি

ঠাসিয়া রাখেন। উদ্দেশ্য যদি লোকগুলা সত্য সত্যই নৌকার উপর চড়াও হয় তাহা হইলে তিনি গুলি চালাইবেন; অধিকাংশ লোককে নৌকার নিকটে আসিতে দেখিয়া ইনি গুলি চালাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু চাপরাশী গুরুদয়াল তাঁহার বন্দুকটি ধরিয়া ফেলে এবং তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলে, "আপনি গুলি চালাইবেন না।" ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হন বটে, কিন্তু অবশেষে গুরুদয়ালের অনুরোধ রক্ষা করেন। অতঃপর তিনি মাঝিদিগকে নৌকা খুলিয়া দিতে ও নদী পার হইতে আদেশ করেন। মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দেয়। তখনও গ্রামবাসীরা তাঁহাকে শাসাইতেছিল। নৌকাখানি নদীর উপর আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে চাপরাশী কেন বন্দুক চালাইতে বাধা দিয়াছিল তাহা বুঝাইয়া বলে। সে বলে, "এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান এবং ভীষণ প্রকৃতির লোক। গুলি চালাইলে কি রক্ষা থাকিত? তাহারা আপনাকে খুন করিত এবং নৌকায় কাহাকেও খুন-জখম করিতে বাকী রাখিত না। আমরা লক্ষ্মীচরের কিনারা হইতে চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছি এবং ইহাতে আমাদের জীবন-রক্ষা হইয়াছে।" চন্দ্রমাধব বাবু এই কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তিনি বরিশালে উপস্থিত হয়েন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ যাইল

তিনি বাসায় পৌঁছিতেই ডাক-হরকরা একখানি সরকারী চিঠি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। চিঠিখানির মর্ম্ম এই—বাখরগঞ্জে আপনাকে যে অস্থায়ী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই নিয়োগ নাকচ করা হইল। চন্দ্রমাধবের জ্যেঠতুত ভাই নীলমাধব বসু তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, তিনি উকীল-

সরকারের কর্ত্তব্য-পালনে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন—এই অপরাধে তাঁহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বর্দ্ধমানের কলেক্টর হগ সাহেবের আদেশে এবং কমিশনার প্লাউডেন সাহেবের সুপারিশে এইরূপ কার্য্য করা হইতেছে। এই সম্পর্কে হগ সাহেব কমিশনার প্লাউডেন সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন তাহার নকল প্লাউডেন সাহেব বরিশালে চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

উক্ত সরকারী চিঠি পাইয়া তিনি অবিলম্বে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি কলেক্টরকে কাজ-কর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন এবং অতি দুঃখে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বরিশাল ত্যাগ করিলেন। এই চাকুরিটী তাঁহার অত্যন্ত পছন্দসই হইয়াছিল; কাজেই ইহা যাওয়াতে তাঁহার ক্লেশের সীমা ছিল না। সে সময়ে তিনি জানিতেই পারেন নাই যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ আরও কত উন্নত। বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, একরূপ বিধাতার বিধানেই তাঁহার এই চাকুরী গিয়াছিল এবং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আইনের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। বরিশাল হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই চন্দ্রমাধবের নৌকা পিরোজপুরে পৌছে এবং সেই রাত্রির জন্য উহা খালে নঙ্গর করিয়া থাকে। সেখানে আরও অনেক নৌকা নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিল। শেষ রাত্রিতে চন্দ্রমাধবের বিহারী ভৃত্য সুধীলাল তাঁহাকে ধীরে ধীরে এই বলিয়া জাগায়,—"চোর আয়া হায়, পাকড়ে গা?" চন্দ্রমাধব বাবু নৌকার পিছন দিকে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার এক পার্শ্বে ছিলেন হরকুমার এবং অপর পার্শ্বে ছিল তাঁহার বন্দুক। বন্দুকে বারুদ ঠাসা ছিল বটে, কিন্তু গুলি ছিল না। তিনি তাড়াতাড়ি বন্দুকে গুলি ভরিয়া হরকুমারকে জাগাইয়া তুলিলেন, হরকুমার চোরের নাম শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে

লাগিলেন। চন্দ্রমাধববাবু নির্ভীক ছিলেন। তিনি বন্দুকটি ধরিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলেন, সুধীলালও একটী বড় দাও লইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া রহিল। এমন সময়ে চুপি চুপি কথাবার্ত্তার শব্দ শুনা গেল এবং একটী ছোট ডিঙ্গী নৌকা একরূপ নিঃশব্দে চন্দ্রমাধব বাবুর নৌকার গায়ে লাগিল। নৌকার চারিধারে যে মাতুরের বেড়া ছিল, তাহার ফাঁক দিয়া দেখা গেল যে, ঐ ডিঙ্গীটাতে চারিজন জোয়ান লোক দাঁড় ধরিয়া বসিয়া আছে। নিশ্চয় তাহাদের নিকট দাও ছিল; কারণ উহাদের মধ্যে একজন নৌকার ঝাঁপ তাড়াতাড়ি কাটিয়া ফেলিল এবং যাহা কিছু পায় তাহা লইবার জন্য নৌকার ভিতর হাত ঢুকাইয়া দিল। সে হাত ঢুকাইবামাত্র সুধীলাল তাহার হাত লক্ষ্য করিয়া দাও চালাইল কিন্তু সেই সঙ্গে বিহারী ভৃত্যদের প্রকৃতিসুলভ গালি সে উচ্চৈঃস্বরে দিতে ভুলে নাই। ইহার ফলে এই হইল যে, চোরটী গোপনে তাহার হাত সরাইয়া লইল এবং সুধীলালের দায়ের আঘাত নৌকার কাঠের উপর পড়িল। চন্দ্রমাধব বাবু তখনই নৌকার ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া বন্দুকের আওয়াজ করিলেন, কিন্তু তিনি নৌকার ভিতর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই চোরেদের ডিঙ্গীখানা কতকটা দূরে চলিয়া গিয়াছিল এবং ২।৩ মিনিটের মধ্যেই ফুলেশ্বর নদীর মাঝামাঝি অগ্রসর হইয়া ছিল। বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া অনেকগুলি নৌকার লোক জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল বটে কিন্তু চোরেরা পলাইয়া গেল এবং তাহাদিগকে ধরিবারও কোন উপায় হইল না।

কলিকাতা যাইবার পথে তিনি তাঁহার পিতার কর্ম্মস্থল খুলনায় অবতরণ করিলেন। এইখানে তাঁহার পিতা, মাতা ও স্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা চন্দ্রমাধবের এত বড় চাকুরী নষ্ট হইল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ-প্রকাশ করিলেন। দুঃখপ্রকাশ ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে অন্য উপায়

ছিল না। খুলনায় একদিন থাকিয়া তিনি কলিকাতা যাত্রা করেন এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর কলিকাতায় পৌঁছেন।

কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার পুরাতন অধ্যাপক মণ্টিয়ো সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলিলেন। মণ্টিয়ো সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য একটী কড়া চিঠির মুসাবিদা করিয়া দিলেন; চিঠিখানিতে তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা করা হইয়াছে তাহার তীব্র প্র তবাদ করা হইল। চিঠিখানিতে আরও বলা হইল যে, তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হয় নাই বলিয়া অত্যন্ত অবিচার হইয়াছে এবং সে জন্য তাঁহার যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা সরকার বাহাদুরকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। এই চিঠির ফলে বাঙ্গালা সরকার বর্দ্ধমানের প্লাউডেন সাহেবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন।

চন্দ্রমাধব বাবু এই সম্পর্কে বাঙ্গালা সরকারের চীফ সেক্রেটারীর সহিতও দেখা করেন। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে হগ সাহেবের সহিত দেখা করিয়া এই ব্যাপার মিটাইয়া ফেলিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাকে বলেন, "হগ সাহেবের নিকট যাইতে আমার মন সরিতেছে না; কারণ আমার আশঙ্কা হয় ইঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে আমি অপমানিত হইব।"

অতঃপর চন্দ্রমাধব বাবু বর্দ্ধমানে গিয়া প্লাউডেন সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চন্দ্রমাধব বাবু বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াই আছেন সুতরাং তাঁহার নিকট চন্দ্রমাধব বাবু আশ্বাসবাণী পাইলেন না। ইহার পর চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত প্লাউডেন সাহেব ও হগসাহেবের অনেক চিঠি লেখালেখি হয়। পরিশেষে গভর্ণমেণ্টের বিচারে ইহাই স্থির হয় যে, চন্দ্রমাধব বাবু উকীল-সরকারের কর্ত্তব্যে বরাবর অবহেলা করিয়া আসিয়া-

ছেন বলিয়া হগ সাহেব কমিশনারের নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা অন্যায় হয় নাই এবং চন্দ্রমাধব বাবু ইচ্ছা করিলে উকীল-সরকাররূপে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া যাইতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, হগ সাহেব বা কমিশনার প্লাউডেন সাহেব—ইঁহাদের দুইজনের কেহই চন্দ্রমাধব বাবু কোন মামলায় লিখিত জবানবন্দী তৈয়ারী করিতে দেরী করিয়াছেন—এই কথা ব্যতীত তাঁহার উপর এমন দোষারোপ করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার এই কার্য্যের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইয়াছে অথবা এই বিলম্বে গভর্ণমেণ্টের মামলা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে বস্তুতঃ চন্দ্রমাধব বাবুর রচিত মামলার জবানবন্দী রাজস্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অথবা লিগ্যাল রিমেম্‌ব্রানসার কর্ত্তৃক আংশিক রূপেও রদবদল করা হয় নাই এবং এই জবানবন্দী যথাসময়ে পেশ করা হইয়াছিল অথচ ইহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব আদেশের নড়চড় হইল না এবং চন্দ্রমাধব বাবুকেও তাঁহারা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পুনরায় বাহাল করিলেন না।

বর্দ্ধমানে আবার উকীল-সরকার হইয়া যাইতে চন্দ্রমাধব বাবুর মন সরিল না, সুতরাং তিনি হগ সাহেবকে একটী কড়া চিঠি লিখিয়া উকীল-সরকারের পদে ইস্তফা দিলেন। এই চিঠিখানি মণ্ট্রিয়ো সাহেব মুসাবিদা করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সদর দেওয়ানী আদালতে তিনি ওকালতী করিবেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, হগ সাহেব ও প্লাউডেন সাহেব তাঁহার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিবার পথে বাধা দিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোনও কিছু করেন নাই। তথাপি চন্দ্রমাধব বাবু পূর্ব্ব-সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের তদানীন্তন প্রধান জজ রাইকেস সাহেবের সহিত দেখা করিয়াছিলেন।

এই রাইকেস সাহেব যখন চট্টগ্রামের কলেক্টর ছিলেন তখন চন্দ্র-মাধব বাবুর পিতা তাঁহার অধীনে ডেপুটী কলেক্টরের কর্ম্ম করিয়াছিলেন ; সুতরাং তিনি চন্দ্রমাধববাবুর প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেন।

সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হইয়া চন্দ্রমাধব বাবু ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ায় দীনবন্ধু মুখার্জ্জীর বহির্ব্বাটী মাসিক আট টাকায় ভাড়া লয়েন। সেই সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ আলিপুরের ট্রেজারীতে জন ইংলিস হার্ব্বে সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে কালীপ্রসন্ন বাবুর একখানি বাড়ী ছিল। তখন চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীট নরিপাড়া নামে অভিহিত হইত। চন্দ্রমাধব বাবু যখন সদর দেওয়ানী আদালতে প্রবেশ করেন তখন রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় ঐ আদালতের বড় উকীল-সরকার এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় ছোট উকীল-সরকার ছিলেন। উকীলগণের মধ্যে রমাপ্রসাদ রায় ছিলেন অগ্রণী ; কেবল জজেদের উপরই যে তাঁহার প্রভূত প্রভাব ছিল তাহা নয়, সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উপর তাঁহার বিপুল প্রভাব ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য যে অধিক ছিল তাহা নহে কিন্তু অত্যন্ত দক্ষতা ও কূটবুদ্ধির সহিত তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। অতি স্পষ্টভাষায় তিনি সওয়াল-জবাব করিতেন। তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন বলিয়া একটী কথা কখনও আটকাইত না ইনি বিখ্যাত হিন্দু-সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র ছিলেন। রমাপ্রসাদ রায় সম্পূর্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি আলিপুরের ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা যখন চট্টগ্রাম হইতে আলিপুরে বদলী হয়েন তখন তিনি এই রমাপ্রসাদ বাবুর হস্ত হইতেই কার্য্যভার বুঝিয়া লইয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ বাবু রাজার মত বাস করিতেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার বাড়ীতে যেন দরবার বসিত। বাঙ্গালাদেশে তখন আর একজনও ব্যক্তি ছিলেন না—

যিনি প্রভাবে-প্রতিপত্তিতে রমাপ্রসাদ বাবুর সমতুল্য। তাঁহার মত প্রভাবশালী অপর একজন ভারতবাসী এ পর্য্যন্ত কচিৎ দেখা গিয়াছে। সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহার সহিত দেখা করিত।

ওকালতীতে এবং পদমর্য্যাদায় ঠিক তাঁহার এক ধাপ নীচের লোক ছিলেন—বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, মুন্সী আমীর আলী, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, মিষ্টার আর-টি এলেন; ইঁহাদের পরের ধাপেই ছিলেন—বাবু দ্বারকানাথ মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকুল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দাস এবং কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত রমাপ্রসাদ বাবু ও শম্ভুনাথ বাবুর অতি সামান্য পরিচয় ছিল; কিন্তু বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ও শ্রীনাথ দাসকে তিনি বিশেষরূপ জানিতেন।

সেই সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতে আরও কয়েকজন ওকালতী করিতেন। তাঁহাদের নামও উল্লেখযোগ্য; একজনের নাম ছিল বাবু মহেন্দ্রলাল সোম, ইনি হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এবং বাবু শ্রীনাথ দাসের সতীর্থ ছিলেন; কিন্তু সুপণ্ডিত হইলেও ওকালতীতে তাঁহার ভাল পশার ছিল না। আর একজন ছিলেন বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত; ইনিও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র, কিন্তু ওকালতীতে ইঁহার ভাল পশার ছিল না। তবে হিন্দু আইনে প্রভূত অধিকার ছিল বলিয়া হিন্দু আইন-সংক্রান্ত অধিকাংশ মামলায় তিনি নিযুক্ত হইতেন। টাকীর ভুবনমোহন চৌধুরী ও মুন্সী আব্বাস আলী এবং পাণ্ডুয়াবাসী একজন মুসলমান উকীলের বেশ পশার ছিল। মুন্সী আব্বাস আলী অতি শিষ্টাচারসম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন। আর একজন উকীল ছিলেন তাঁহার নাম গোপাললাল মিত্র; ইনি চমৎকার বলিতে কহিতে পারিতেন কিন্তু তিনি কতকটা অলস এবং আত্মোন্নতির প্রতি উদাসীন ছিলেন। তবে তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত উদার,

স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর এবং তাঁহার বিবেকবুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি যদি ওকালতীর দিকে মন দিতেন, তাহা হইলে খুব বড় পশারওয়ালা উকীল হইতে পারিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত শীঘ্রই ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। গোপাল বাবুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুন্ন ছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোপাল বাবু ওকালতী ছাড়িয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েন এবং পরে পেন্সন লইয়া উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান। আর একদল যুবক সেই সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে চন্দ্রমাধবের কলেজের সহপাঠী আনন্দগোপাল পালিত ও কালীকৃষ্ণ সেন কিছু কিছু কাজ-কর্ম্ম করিতেছিলেন। ইঁহারা দুইজনেই চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু ছিলেন। আর একজন ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র (পরে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র)। রমেশচন্দ্র কলেজে চন্দ্রমাধব অপেক্ষা দুই ক্লাস নীচে পড়িতেন। ইনি ভবানীপুরের রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র, তাঁহার সম্বন্ধে পরিচয় ইতি-পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। রমেশচন্দ্র বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী যুবক ছিলেন, তবে সেই সময়ে ওকালতীতে তাঁহার কিছু হইত না বলিলেই হয়। আর একজন উকীল ছিলেন তাঁহার নাম বাবু দুর্গামোহন দাস; তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রসিদ্ধ মোক্তার বারেশ্বর দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন সুতরাং তাঁহার পিতৃব্যের দ্বারা কিছু কিছু মামলা পাইতেন। তাঁহার ভ্রাতা কালীমোহন দাস বরিশালের উকীল-সরকার ছিলেন। কালীমোহন বাবু কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আসিতেছেন বলিয়া দুর্গামোহন বাবু বরিশালের উকীল-সরকার হইবার জন্য বরিশালে গমন করেন। আর একজনের নাম বাবু রাধানাথ বসু, ইনি মজিলপুরের দত্তদিগের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন; ইনি যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই সময় চন্দ্র-মাধব বাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিতেন এবং পড়াশুনায়

তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য লইতেন। চন্দ্রমাধব বাবু যখন সদর দেওয়ানী আদালতে প্রবেশ করেন তখন রাধানাথ বাবু তথাকার এটর্নী ছিলেন এবং উকীল-হিসাবে কিছু কিছু মামলা-জোগাড়ের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছিলেন। সদর ষ্ট্রীটের একটী বাড়ীতে তিনি একটী ঘর ভাড়া লইয়া অফিস করিয়াছিলেন। তিনি এত ভাল লোক ছিলেন যে, ঐ ঘরের একাংশ চন্দ্রমাধব বাবুকে সিকি ভাড়ায় ভাড়া দিয়াছিলেন।

সেই সময়ে কয়েকজন জজের নাম এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বড় ছিলেন রাইকেস সাহেব; তাঁহার পরবর্ত্তী জজের নাম মিষ্টার বিণী ট্রেভর; তাঁহার পরবর্ত্তী জজের নাম মিষ্টার রেলি। আর একজন জজের নাম ছিল মিষ্টার ষ্টীয়ার। আণ্ডার কোর্টে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচজন জজ ছিলেন। এই সময়কার আর একজন জজের নাম ছিল মিষ্টার লচ; ইনি চন্দ্রমাধব বাবুর প্রবেশের পূর্ব্ব হইতে ছিলেন কি পরে আসিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না।

রাইকেস সাহেব সেকালের সিবিলিয়ান ছিলেন, তিনি জবরদস্ত হাকিম ও সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু আইনে তাঁহার বেশী অধিকার ছিল না। ট্রেভর সাহেব উৎকৃষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন। রেলি সাহেব শিষ্টাচারসম্পন্ন, সহৃদয় এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। ষ্টীয়ার সাহেবের সম্বন্ধে অধিক বলিবার কিছু নাই।

চন্দ্রমাধব বাবু যখন সদর দেওয়ানী আদালতে যোগদান করেন তখন তাঁহার সহিত প্রায় কোনও মোক্তারের পরিচয় ছিল না। অখিলচাঁদ সেন নামক একজন মোক্তার ছিলেন তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর স্বগ্রামবাসী; ইনি গোলোকচাঁদ সেনের ভ্রাতা ছিলেন। গোলোক বাবু চন্দ্রমাধব বাবুকে বাল্যকালে দেখিয়াছিলেন। রামলাল গোঁসাই নামক আর একজন মোক্তার ছিলেন, তাঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর যৎসামান্য পরিচয় ছিল, কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার নিকট তিনি

সুপরিচিত ছিলেন; আর একজন মোক্তার ছিলেন তাঁহার নাম গুরুপ্রসাদ দাস, ইহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর পরিচয় না থাকিলেও ইহার পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল; গুরুপ্রসাদ বাবু বেশ ভাল লোক ছিলেন। আর একজন মোক্তারের নাম বৈকুণ্ঠ চক্রবর্ত্তী, ইনি চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার সহিত পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি চন্দ্রমাধববাবুকে কোনও প্রকার সাহায্য করিতেন না। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের বড় মোক্তার বীরেশ্বর দাস সদর দেওয়ানী আদালতে মোক্তারী করিতেন। সকল মোক্তারেরই জন্মস্থান ছিল হয় বিক্রমপুর, নয় ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থান।

ফকিরচাঁদ সেন, আনন্দনাথ চৌধুরী নামক জনৈক বৃদ্ধ মুহুরীকে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত পরিচিত করাইয়া দেন; ইনি পূর্ব্বে মুনসেফ্ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সুতরাং চন্দ্রমাধব বাবুকে খুব বেশী রোজগার করিবার আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াই ওকালতী আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। তবে তাঁহার ইচ্ছা ছিল পিতার নিকট হইতে কোনও প্রকার সাহায্য গ্রহণ না করা—কোনও রূপে নিজের উপায়ে নিজেকে চালাইয়া লওয়া। ওকালতী আরম্ভ করিবার সময়ে তাঁহার হাতে পুঁজি ছিল মাত্র ১৫০৲ টাকা। ইহা তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহার বেতন এবং বরিশালে যাইবার পাথেয়-হিসাবে পাইয়াছিলেন।

মধ্যে মধ্যে তিনি ২।১টী ছোট খাটো মামলা পাইতেন, তাহাতেই তাহার কোনও রূপে চলিয়া যাইত। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত উকীলদিগের কেহই তাঁহাকে কোনও প্রকার সাহায্য করেন নাই। তবে প্রসিদ্ধ উকীল বাবু শ্রীনাথ দাস মধ্যে মধ্যে দুই একটী মামলায় তাঁহাকে জুনিয়র বা সহকারী লইতেন। ২।৩ মাস এইভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ অবস্থার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার অনুকূল

হইয়া উঠিল। মোক্তার গুরুপ্রসাদ বাবু একটী "রিভিউ" মামলায় তাঁহাকে শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সহকারী নিযুক্ত করেন। ফী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ১২৲টাকা। তখনকার দিনে"রিভিউ"মামলায় প্রায়ই এডভোকেট জেনারেল মিষ্টার রীচি, মিষ্টার ডয়েন প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় ব্যারিষ্টার সদর দেওয়ানী আদালতের দরখাস্তকারীদের তরফে দাঁড়াইতেন। কখনও কোনও জুনিয়র বা নূতন উকীল এই মামলায় দাঁড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইতেন না।

চন্দ্রমাধব বাবু শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের জুনিয়র-হিসাবে এই মামলা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মামলাটীর বিচার হইয়াছিল মিষ্টার রাইকেস ও মিষ্টার ষ্টীয়ারের এজলাসে। যখন মামলাটীর শুনানী উঠিল, সেই সময়ে আদালতে উকীল, মোক্তার, মামলাকারী প্রভৃতির অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। অপর পক্ষে উকীল ছিলেন বাবু শম্ভূনাথ পণ্ডিত, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, মিষ্টার আর টি এলেন এবং সম্ভবতঃ রেভিনিউ বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য মিষ্টার এইচ ষ্টেমফোর্ড। শ্রীনাথবাবু মামলা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই; সেইজন্য তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে সওয়াল জবাব করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আদালতে অনেকগুলি মোক্তার উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা বলিলেন, "রাইকেস সাহেব বড় কড়া লোক; আপনি নূতন উকীল, এত বড় মামলায় সওয়াল জবাব করিবেন না; হয় ত আপনাকে এমন ধমক দিবেন যাহাতে আপনার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইবে।" ইহা শুনিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর ভয় হইল কিন্তু শ্রীনাথ,দাস মহাশয় তাঁহাকে ছাড়িলেন না.কাজেই সওয়াল জবাব করিবার জন্য চন্দ্রমাধব বাবুকে, দাঁড়াইতে হইল। একজন নূতন উকীলকে দাঁড়াইতে দেখিয়া জজেরা কতকটা বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছু বলিলেন না—আইনতঃ বলিতেও পারেন না। জজেরা তাঁহার বক্তৃতা ধীরভাবে শুনিতে

লাগিলেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া রাখিতে লাগিলেন। জজ রাইকেস সাহেব যখন মামলার বিবরণ অবগত হইলেন তখনই তিনি মামলাটীর খুঁটিনাটী লইয়া চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত আলোচনা আরম্ভ করিলেন অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা ও বিচার-বিতর্ক হইতে লাগিল। অতঃপর রাইকেস সাহেব চন্দ্রবাধব বাবুর একটী যুক্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা বালকোচিত। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু আর অধিক আলোচনা করা সঙ্গত মনে করেন নাই এবং বসিয়া পড়েন। "রিভিউ" বা পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা না-মঞ্জুর হইয়া গেল বটে কিন্তু যখন এজলাসে সমবেত উকীল-মোক্তারেরা এজলাস হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন অপর পক্ষের প্রধান উকীল শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় অগ্রসর হইয়া আসিয়া চন্দ্রমাধবের করমর্দ্দন করেন এবং বলেন, "এই আদালতে আপনার প্রথম সওয়াল জবাব শুনিয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি ; আপনি যেভাবে মামলাটী চালাইয়াছেন তাহাও প্রশংসনীয়।" বহুলোকের সম্মুখে শম্ভুনাথ বাবু এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; চন্দ্রনাথ বাবু অবগত হন যে, ঐদিনই শম্ভুনাথ বাবু তাঁহার যোগ্যতার কথা কয়েক জন মোক্তারকেও বিশেষ করিয়া বলেন। ইহার ফল এই হইল যে, কয়েক জন মোক্তারের নিকট হইতে তিনি ৫।৬টী মামলা পাইলেন। এই ঘটনাই চন্দ্রমাধব বাবুর জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল এবং এই ঘটনার দিন হইতেই তাঁহার ওকালতীর পশার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

আইনের অধ্যাপনা

প্রায় এই সময়ে - সম্ভবতঃ উক্ত ঘটনার পরে তাঁহার পুরাতন অধ্যাপক মন্ট্রিয়ো সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে অনুরোধ করেন যে,প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণকে মফঃস্বলের

রাজস্ব-সংক্রান্ত আইন-বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে হইবে। মণ্টিয়ো সাহেব তখনও প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু জানিতেন ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন বি-এ এবং সম্ভবতঃ এম-এ উপাধিধারী আছেন এবং উহারা বয়সেও প্রায় তাঁহার সমান; কাজেই এই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিলেন এবং মণ্টিয়ো সাহেবকে বলিলেন, এরূপ কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতে আমি ইচ্ছুক নহি; কিন্তু মণ্টিয়ো সাহেব তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন চন্দ্রমাধবের এ কার্য্য করিবার যথেষ্ট যোগ্যতা আছে। অগত্যা চন্দ্রমাধব বাবু বাধ্য হইয়া এই কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং সপ্তাহে দুই দিন করিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত আইন ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র মল্লিক (ইনি পরে ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন ও ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের পিতা) এবং বি-কে মল্লিক (ইনি পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা গভীর মনোযোগের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বক্তৃতা শুনিতেন। চন্দ্র-মাধব বাবু পরে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে ইঁহাদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি যে কয়মাস মণ্টিয়ো সাহেবের হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন সেই কয়মাস মাসিক ৩০০৲ টাকা হিসাবে বেতন তিনি পাইতেন। প্রথমে চন্দ্রমাধব বাবু বেতনের টাকা লইতে চান নাই কিন্তু পরে মণ্টিয়ো সাহেবের নির্ব্বান্ধাতিশয্যে তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে হয়। এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পর পর দুই বৎসর—প্রতি বৎসরে পাঁচমাস করিয়া তাঁহাকে মণ্টিয়ো সাহেবের হইয়া এই অধ্যাপনার কার্য্য করিতে হইত। ক্রমে ইহাও বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

সরকার-পক্ষে ডাকাতি মামলায় নিযুক্ত

এই সময়ে হুগলীর ডাকাতি-কমিশনার রেলী সাহেব একটী বড় ডাকাতি-মামলা পরিচালনের জন্য চন্দ্রমাধব বাবুকে সরকার-তরফে নিযুক্ত করেন। মামলাটী হুগলীর তদানীন্তন অতিরিক্ত দায়রা-জজ বার্চ্চ সাহেবের এজলাসে বিচারাধীন ছিল। এই বার্চ্চ সাহেব পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কলেক্টর ছিলেন। জুরীর সাহায্যে মামলাটীর বিচার হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। রেলী সাহেবের অধীনস্থ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় চন্দ্রমাধব বাবুর পুরাতন বন্ধু, তাঁহারই চেষ্টায় চন্দ্রমাধব বাবু এই মামলাটী পাইয়াছিলেন। হুগলীর উকীল-সরকার ঈশানচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে এই মামলায় গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন নাই বলিয়া তিনি আসামীদের তরফে দাঁড়াইয়াছিলেন। মামলাটী তিনদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং চন্দ্রমাধব বাবুকে মামলাটীর জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। উভয় পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি শেষ হইবার পর এবং আসামী-দের তরফের সওয়াল জবাব শেষ হইবার পর দায়রা-জজ বার্চ্চ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে বলেন, "আপনার আর সওয়াল জবাব করিবার প্রয়োজন নাই, আমি মামলাটী জুরিদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি।" চন্দ্রমাধব বাবু ইহা একবারেই পছন্দ করেন নাই কিন্তু জজ যাহা করিতে যাইতেছিলেন তাহাতেও বাধা দেওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। অধিকাংশ জুরী ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া জজ তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় চার্জ্জ বুঝাইয়া দেন। জজ ভাল বাঙ্গালা বলিতে না পারায় জুরীরা তাঁহার কথা বুঝিতে পারেন নাই। এদিকে জজ সাহেব জুরীদিগকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়াই তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের অভিমত কি?" কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর জুরীদের নায়ক কতকটা থতমত খাইয়া এলোমেলোভাবে এমন কয়েকটী কথা

বলিলেন,—যাহার অর্থ হয় মামলাটী প্রমাণ হয় নাই। চন্দ্রমাধব বাবু তখনই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি কি করিতে যাইতেছেন তাহার ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে কাহাকেও প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই তিনি জুরীদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "থামুন, থামুন।" তার পর তিনি জজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, জুরীদিগকে কি করিতে হইবে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি সংক্ষেপে মূল সমস্যাগুলি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করি।" জজ বার্চ্চ সাহেবও জুরীদের ভাব-ভঙ্গীতে ও কথায় এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে চন্দ্রমাধব বাবুর কথায় সম্মত হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। যাহা হউক, চন্দ্রমাধব বাবু তখনই সংক্ষেপে জুরীদিগকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। জুরীরা তখন আসামীদিগকে সকল অপরাধে অপরাধী বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। জজ বার্চ্চ সাহেব জুরীদের এই অভিমত শুনিয়া মৃদু হাস্য করিলেন এবং আসামীদিগের প্রতি চৌদ্দ বৎসর, দশ বৎসর—এইরূপ দীর্ঘকালের জন্য কঠোর কারাদণ্ডভোগের আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য, ভুল করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, জুরীদের অভিমত প্রকাশিত হইবার পর কোন উকীল আর কিছু বলিতে পারেন না, বলিলে উহা বে-আইনি হয় কিন্তু জুরীরা মামলাটী না বুঝিয়া দায়িত্বহীনভাবে মতপ্রকাশ করিবেন এবং তাহার ফলে প্রকৃত অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাইবে—ইহা চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল ; কারণ এই মামলায় যাহারা আসামী হইয়াছিল তাহারা সত্যসত্যই ডাকাত ছিল। তখনকার কালে সিবিলিয়ানগণ বাঙ্গালা ভাষা ভালরূপ জানিতেন না এবং এখনকার কালেও অনেক সিবিলিয়ান জানেন না। তখনকার কালের সিবিলিয়ানরা তাই জুরীদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতে ঠিকমত পারিতেন

না। এক্ষণে সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। এক্ষণে জুরীরা ইংরাজী বুঝিতে পারেন বলিয়া জজেরা ইংরাজীতেই জুরীদিগকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দেন।

হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাতন সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত এই দুইটীর সম্মিলনে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। তখন এই দুইটী আদালতে যে সকল জজ ছিলেন তাঁহারাই নব-প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজ হন। হাইকোর্টের আপীল বিভাগ তখন ভবানীপুরের যে বৃহৎ বাটীতে সদর দেওয়ানী আদালত বসিত সেই বাড়ীতে বসিতে থাকে এবং হাইকোর্টের আদিম বিভাগের কার্য্য সুপ্রীম কোর্টের পুরাতন বাড়ীতেই চলিতে থাকে। আইন অনুসারে স্থির হয় যে, হাইকোর্টের জজের সংখ্যা পনের জনের অধিক হইবে না; তিন ভাগের এক ভাগ বিচারপতি সিবিলিয়ান ও বাকী ব্যারিষ্টার হইবেন। দেশীয় জজ কত জন বসিবেন তাহার বিষয়ে কোন কিছু বলা হয় নাই। রমাপ্রসাদ রায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় জজ নিযুক্ত হয়েন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইনি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল-সরকার এবং বাঙ্গালা দেশের একজন প্রভূত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। দুঃখের বিষয়, নিয়োগ-পত্র আসিবার পূর্ব্বেই রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে কাহাকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হইবে ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। রমাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর পর বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের উকীল-সরকার নিযুক্ত হন। তখন ওকালতীতে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় পনের হাজার টাকা হইত। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় হাইকোর্টের

জজ নিযুক্ত হন। সুতরাং শম্ভুবাবুকে হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি বলা যাইতে পারে।

একবার কথা উঠে যে, যে সকল উকীল সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন অর্থাৎ তথাকার উকীলশ্রেণীভুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে নব-প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের উকীল(vakil)করা যাইতে পারে কি না। ইহাতে উকীলদিগের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। অবশেষে নিম্নরূপ ব্যবস্থায় এই চাঞ্চল্য দূরীভূত হইল :—

যে সকল ব্যারিষ্টার সুপ্রীম কোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে হাইকোর্টের এডভোকেট এবং সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল উকীল ওকালতী করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে হাইকোর্টের উকীল ও এটর্নী করা হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত বিচারপতিগণকে লইয়া হাইকোর্ট কার্য্যারম্ভ করেন—স্যার বার্ণেস পিকক (প্রধান বিচারপতি), স্যার চার্লস জ্যাকসন, স্যার মার্ডুয়্যাণ্ট ওয়েলস (ইহারা তিনজনে সুপ্রীম কোর্টের জজ ছিলেন); মিষ্টার এইচ-টি রাইকেস. জি লীচ, সি-বি ট্রেভর, এইচ-ভি বেলী, সি-ষ্টীয়ার এবং এফ-বি-কেম্প্ (হারা সকলেই সিভিলিয়ান ও সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন)

হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে পর স্যর বার্ণেস পিকক আপীল বিভাগের বিচারাসনে বসিতে আরম্ভ করেন এবং কিছুকাল তথায় বসিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার সহযোগী ছিলেন বিচারপতি মিষ্টার বেলী এবং বিচারপতি মিষ্টার কেম্প্। স্যর বার্ণেস পিককের আইনে প্রভূত জ্ঞান ছিল এবং কর্ম্মশক্তি, অধ্যবসায় ও দক্ষতা ছিল অসাধারণ; ছোট বড় সকল মামলাই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিতেন; তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন; উকীল ও ব্যারিষ্টারে তিনি কোনও ভেদ

রাখিতেন না। ইনি সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন এবং সে ব্যবহারও ছিল অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্টাচারপূর্ণ। এইজন্য তিনি হাইকোর্টে এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং জনসাধারণের মনেও এমন ধারণার সঞ্চার করিয়াছিলেন—যাহার সমান আবহাওয়া ও ধারণা এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, অতিক্রম করা ত দূরের কথা। স্যর বার্ণেস্ পিকক যখন এজলাসে বসিতেন তখন এজলাস যেন গম্ গম্ করিত, এজলাসে সর্ব্বত্র একটা গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিত, একটা ভয়ের ভাব সকলের মনেই থাকিত। কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার তাঁহার এজলাসে ফাঁকা কথা বলিতে বা ধাপ্পা দিতে পারিতেন না। প্রত্যেক উকীল বা ব্যারিষ্টারকেই তাঁহার মামলা ভাল করিয়া বুঝিয়া এবং তৎসম্পর্কিত আইন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার এজলাসে হাজির হইতে হইত। তিনি খর্ব্বাকৃতি ছিলেন কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটী ছিল বৃহৎ ও উজ্জ্বল। যদি সওয়াল জবাব-কারী কোন উকীল বা ব্যারিষ্টারের প্রতি তিনি তাকাইতেন, তাহা হইলে মনে হইত, তিনি সেই উকীল বা ব্যারিষ্টারের মনের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, ইহার ফল ইহাই হইত যে, উক্ত উকীল বা ব্যারিষ্টার অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁহার যুক্তি-তর্ক ও নজীর প্রয়োগ করিতেন। স্যর বার্ণেস পিকক অত্যন্ত নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন। প্রত্যহ ঠিক বেলা ১১টার সময় তিনি বিচারাসনে উপবেশন করিতেন। তার পর জলযোগের সময়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন এবং অপরাহ্ন সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত বিচারকার্য্য করিতেন। অতঃপর তালিকাভুক্ত পরবর্ত্তী মামলার বিচার আরম্ভ করিতেন এবং যতক্ষণ না উহা শেষ হইত—এমন কি বিচার শেষ করিতে যদি রাত্রি ৮টাও বাজিত ততক্ষণ তিনি এজলাস হইতে উঠিতেন না। তাঁহার খাটিবার শক্তি এতই বিপুল ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিচারপতি মিষ্টার বেলী ও বিচারপতি

মিষ্টার কেম্প তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া বিচার করিতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। একবার একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিচারপতি মিষ্টার কেম্প্ যখন বাখরগঞ্জের জেলা-জজ ছিলেন সেই সময়ে তিনি একটী মামলার বিচার করিয়াছিলেন; সেই মামলায় তিনি যে রায় দিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল রুজু হইয়াছিল; ঘটনাচক্রে স্তর বার্ণেস পিকক, বিচারপতি মিষ্টার বেলী ও বিচারপতি মিষ্টার কেম্পের এজলাসেই এই আপীল-মামলার বিচার-ভার পড়ে। মামলাটীর শুনানী আরম্ভ হইবামাত্র বিচারপতি মিষ্টার কেম্প স্তর বার্ণেস পিকককে বলেন, নিম্ন আদালতে এই মামলার বিচার আমিই করিয়াছি সুতরাং এই মামলার আপীল শুনা আমার কর্ত্তব্য কি? স্তর বার্ণেস পিকক বলিলেন, "আপনি থাকুন এবং আমার সহিত এই মামলার বিচার করুন।" ইহা আইনসঙ্গত কি না তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, এই আপীল মামলার বিচার শেষ হইল। বিচারে কেম্প্ সাহেবের নিম্ন আদালতের রায় উল্টাইয়া গেল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, বিচারপতি মিষ্টার কেম্প্ স্তর বার্ণেস পিককের রায়ের সহিত একমত হইলেন। এইপ্রকার অদ্ভুতভাবে স্তর বার্ণেস পিকক হাইকোর্টের বিচারকার্য্য পরিচালনা করিতেন এবং তাঁহার নিম্নতম বিচারপতিরা তাঁহাকে এমন ভয় করিতেন যে, তিনি যতক্ষণ এজলাস হইতে না উঠিতেন ততক্ষণ তাঁহারা কেহ আদালত হইতে বাড়ী যাইতেন না। একদিন অপরাহ্নে জনৈক বিচারপতির স্তর বার্ণেস পিকক এজলাস হইতে উঠিবার পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল; তিনি তাঁহার গাড়ী জজেরা যে দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে চড়েন সেই দরজায় না আনাইয়া অন্ত দরজায় আনাইয়া রাখেন এবং কোনও রূপে সরিয়া পড়েন।

স্তর বার্ণেস পিকক অপেক্ষা কড়া জজ আর একজনও হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে উপবেশন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার একটীমাত্র দুর্ব্বলতা ছিল—তাঁহার পুত্র ইংলণ্ড হইতে এদেশে ব্যারিষ্টারী করিতে আসিয়াছিলেন স্তর বার্ণেস তাঁহার পুত্রকে তাঁহারই এজলাসে ব্যারিষ্টারী করিতে দিতেন। তাঁহার পিতার এজলাসে কয়েকটী মামলা পরিচালনের জন্ম তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। অবশ্য এরূপ কথা বলিতে পারা যায় না যে, স্তর বার্ণেস কোন মামলায় তাঁহার পুত্রের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তবে এরূপ দেখা যাইত যে, তাঁহার পুত্র যখন সওয়াল জবাব করিতেন তখন প্রায়ই স্তার বার্ণেস তাঁহাকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা সাহায্য করিতেন, এমন কি তাঁহার যুক্তির স্বপক্ষে নজীরের পুস্তকও মধ্যে মধ্যে তাঁহার হাতে দিতেন। উকীল-ব্যারিষ্টার-মহলে এই লইয়া অনেক কথা উঠিয়াছিল এবং অনেকে এইজন্ম স্তর বার্ণেস পিককের দোষ দিতেন। স্তর বার্ণেস পিককের এই পুত্রটী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং সকল বিভ্রাটের অবসান ঘটে। স্তর বার্ণেস পিকক প্রধান বিচারপতির আসনে উপস্থিত থাকিবার কালে এই একটী মাত্র দোষের কার্য্য করিয়াছিলেন। আর একজন বিচারপতি কিছু কাল পরে তাঁহার ব্যারিষ্টার-পুত্রের প্রতি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন—সেই জজের নাম ছিল মিষ্টার লুই জ্যাকজন।

এই দুইটী ব্যাপার চন্দ্রমাধব বাবুর মনে বরাবরই জাগরূক ছিল; ১৮৮৫ সালে যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন তখন সর্ব্বপ্রথমেই তিনি তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে বলিলেন—তুমি আমার এজলাসে কোন মামলা লইয়া দাঁড়াইও না; অবশ্য সিনিয়র উকীলের সহকারীরূপে দাঁড়াইতে পারিবে। চন্দ্রমাধব বাবুর এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্তার রিচার্ড গার্থ তাঁহার পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আসিলে তাঁহাকে নিজের

এজলাসে দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পুত্র মিষ্টার ডব্লিউ গার্থ আদিম বিভাগ হইতে প্রেরিত এমন আপীল মামলায় তাঁহার পিতার এজলাসে দাঁড়াইতে অনুমতি পাইয়াছিলেন যে মামলায় আদিম বিভাগে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

বিচারপতি স্যর চার্লস জ্যাকসন অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্যক্তি ছিলেন; তিনি মধ্যে মধ্যে আপীল-বিভাগের বিচারাসনে বসিতেন। ইনি ভদ্র, শিষ্টাচারসম্পন্ন ও যোগ্য বিচারক ছিলেন এবং উকীল-ব্যারিষ্টারের যোগ্যতাও বুঝিতে পারিতেন কিন্তু তিনি দণ্ড দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। একবার চন্দ্রমাধব বাবু ইঁহার এজলাসে একটী মামলায় উকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আপীলকারীর পক্ষে উকীলের বক্তব্য শুনিয়া বিচারপতি স্যার চার্লস জ্যাকসন তাঁহারই দিকে ঢলিয়া পড়েন এবং চন্দ্রমাধব বাবুকে প্রতিবাদীর পক্ষে কি বলিবার আছে তাহা বলিতে বলেন; চন্দ্রমাধব বাবু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার মামলার সওয়াল জবাব করেন। স্যর চার্লস জ্যাকসন চন্দ্রমাধব বাবুর মক্কেলের অনুকূলেই রায় দিয়াছিলেন। রায় দিবার সময় তিনি বলেন, প্রথমে আমি চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতিকূলেই রায় দিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর অটুট যুক্তিপূর্ণ সওয়াল জবাব না শুনিলে আমি তদ্রূপ রায়ই দিতাম।

বিচারপতি স্যর মরডুয়্যাণ্ট ওয়েলস কখনও আপীল বিভাগে বসেন নাই। শক্তিশালী বিচারক বলিয়া তিনি পরিচিত ছিলেন তবে মধ্যে মধ্যে তিনি বিচারকোচিত গণ্ডী অতিক্রম করিতেন।

বিচারপতি মিষ্টার রাইকেস অত্যন্ত দক্ষ এবং দ্রুতবিচারক্ষম ছিলেন তবে তিনি জুনিয়র উকীল-ব্যারিষ্টারদিগের প্রতি বড় শিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতি তিনি বরাবরই সদয় ছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার ট্রেভরের আইনে অত্যন্ত অধিকার ছিল এবং তাঁহার প্রভূত বিচারবুদ্ধিও ছিল। সিবিলিয়ন জজদিগের মধ্যে তিনিই যোগ্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

বিচারপতি মিষ্টার লীচ্ অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সকলের সহিতই তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন, তবে তিনি দক্ষ ছিলেন না এবং বিচারকার্য্যে অনুচিত বিলম্ব করিতেন।

বিচারপতি মিষ্টার বেলীও অত্যন্ত ভদ্র ও সদয়হৃদয় ছিলেন। যোগ্য বিচারপতি না হইলেও ইনি নিরপেক্ষ বিচার করিতে এবং বিচারাসনে বসিয়া স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার এজলাসে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ঘটনাটী এই :— বিচারপতি মিষ্টার বেলী ও বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ারের এজলাসে একবার সমস্যা উঠে যে, এডভোকেট ও উকীল এই দুইজনের মধ্যে কে অগ্রে আদালতকে সম্বোধন করিবার অধিকারী হইবে? এডভোকেট মনোমোহন ঘোষ ও উকীল বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের এজলাসে একই মামলায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমস্যা হইল, এডভোকেট মনোমোহন ঘোষ অথবা উকীল অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—এই দুই জনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অগ্রে আদালতকে মামলা-সম্পর্কে সম্বোধন করিবেন? কাহার এরূপ সম্বোধনের প্রথম অধিকার? সমস্যা উঠিতেই বিচারপতি মিষ্টার বেলী ও বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ার দুইজনে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। বিচারপতি মিষ্টার বেলী বলিলেন, যিনি বেশীদিন আইন-ব্যবসায় করিতেছেন তিনি উকীলই হউন অথবা এডভোকেটই হউন, তিনিই অগ্রে আদালতকে সম্বোধন করিবার অধিকার পাইবেন। বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ার বলিলেন,—এডভোকেটই আদালতকে

সম্বোধন করিবার প্রথম অধিকার পাইবেন। উভয় বিচারপতির মধ্যে এইরূপ মতবিরোধ ঘটিল বলিয়া বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ার তৎক্ষণাৎ প্রধান বিচারপতি স্তর বার্ণেস পিককের নিকট যাইলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। স্তর বার্ণেস অবিলম্বে বিচারপতি মিষ্টার বেলী ও বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ারের এজলাসে এই সমস্যা-নিবারণের জন্য উপস্থিত হইলেন। স্তর বার্ণেস পিকক বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ারের অভিমতেরই সমর্থন করিলেন। তিনিও বলিলেন—এডভোকেটগণেরই অগ্রে আদালতকে সম্বোধন করিবার অধিকার আছে। কেন না, হাইকোর্টের লেটারস পেটেণ্টে ব্যবহারাজীবগণের শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—এডভোকেট, উকীল ও এটর্ণী, বিশেষতঃ এডভোকেট বা ব্যারিষ্টারগণ ইংলণ্ডে উৎকৃষ্টতর শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিচারপতি মিষ্টার বেলী স্তর বার্ণেসের এই অভিমত গ্রহণ করিলেন না। তিনি এই মত দিলেন যে, সদর দেওয়ানী আদালতেই হউক বা সুপ্রীম কোর্টেই হউক, যিনি এই দুইটী আদালতের একটীতে অপরের অপেক্ষা অগ্রে ভর্ত্তি হইয়াছেন, তিনিই আদালতকে প্রথম সম্বোধন করিবার অধিকার-প্রাপ্ত। উকীলদিগকে আমি অধিকতর অধিকার-বিশিষ্ট এডভোকেট বলিয়াই মনে করি। প্রধান বিচারপতি স্তর বার্ণেসের মতের সমর্থন না করিয়া তাঁহার সম্মুখেই স্বাধীনভাবে আত্মমত প্রকাশ করিয়া বিচারপতি মিষ্টার বেলী স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার বেলীর সহৃদয়তা ও শিষ্টতা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ছিল। একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটী এই—চন্দ্রমাধববাবু ট্রেণের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিতে গিয়া দেখিলেন—উহাতে কয়েক জন ইউরোপীয় মহিলা ও ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। ট্রেণের অপর কোনও কামরায়ও স্থান

ছিল না। কিন্তু এই কামরাটীতে তুই এক জনের স্থান তখনও ছিল। সেইজন্য তিনি এই কামরাটীতে উঠিতে যাইতেছিলেন। তিনি যখন কামরার ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়েন সেই সময়ে উহার মধ্যস্থ আরোহীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, এখানে আর জায়গা নাই। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া এই কামরায় স্থান পাইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন। এমন সময়ে চন্দ্রমাধব বাবুকে পরিচিত-স্বরে এক ভদ্রলোক আহ্বান করিলেন। মুখ ফিরাইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, বিচারপতি মিষ্টার বেলি তাঁহাকে আহ্বান করিতে-ছেন এবং বলিতেছেন—আপনি কামরার ভিতরে প্রবেশ করুন। চন্দ্র-মাধব বাবু ট্রেণের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বিচারপতি মিষ্টার বেলি দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে জনৈকা ইউরোপীয় মহিলার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন। তার পর তিনি সেই মহিলার সহিত চন্দ্রমাধববাবুর পরিচয় করিয়া দেন।

মিষ্টার ব্রাউটন নামক অপর একজন বিচারপতি ট্রেণের উক্ত কামরায় ছিলেন; কিন্তু তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে স্থান দিবার জন্য কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই। সে যাহা হউক, বিচারপতি মিষ্টার বেলির অনুগ্রহে ও ভদ্রতায় চন্দ্রমাধববাবু অত্যন্ত আরামে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন,—আপনি কোথায় যাইতেছেন? চন্দ্রমাধববাবু অল্পক্ষণই ট্রেণে ছিলেন; সেই সময়টুকু বেলি সাহেব নানারূপ কথাবার্তায় তাঁহাকে প্রীত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার ষ্টীয়ার বেশ ভাল লোক ছিলেন; কিন্তু বিচারক-হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল না। তিনি ছিপে করিয়া মাছ ধরিতে ভালবাসিতেন এবং ছুটী পাইলেই বড় বড় পুকুর বা দীঘিতে মাছ ধরিতেন।

বিচারপতি মিষ্টার কেম্পের বিচারকার্য্যে অভিজ্ঞতা ছিল; তিনি সহৃদয়, শিষ্টাচারসম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি নম্র ছিল। দৃঢ়চেতা বিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল না, তিনি দুর্ব্বলচিত্ত বিচারক ছিলেন।

হাইকোর্ট যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতে বিস্তর মামলা বিচারাধীন ছিল। এই সকল মামলার বিচার শীঘ্র শীঘ্র শেষ করাই হাইকোর্টের বিচারপতিরা তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তখনকার প্রথানুসারে আপীল বিভাগে আপীল পেশ করিবার সময়ে আপীলের কারণগুলি ইংরেজী, অথবা বাঙ্গালা অথবা উর্দ্দু ভাষায় লিখিয়া দেওয়া হইত। বিচারপতি ও উভয়পক্ষীয় উকীলগণের জন্য যথারীতি পেপার বুক (Paper-book) তখন দাখিল করা হইত না। আপীল পেশ করিবার সময়ে বিচারপতি ও উকীলগণের হাতে নিম্ন আদালতের রায় ও আপীলের দরখাস্তের ইংরেজী অনুবাদ একত্র গাঁথিয়া দেওয়া হইত। হাইকোর্টের কয়েকটী এজলাসে আরও অল্প কিছু দিন ধরিয়া ইংরেজী বা উর্দ্দুতে সওয়াল জবাব করা হইত বটে, কিন্তু স্যর বার্ণেস পিককের এজলাসে অথবা আপীল বিভাগের কোনও ব্যারিষ্টার জজের এজলাসে ইংরেজীতেই সওয়াল জবাব করিতে হইত, উর্দ্দুতে সওয়াল জবাব করা চলিত না। মুন্সী আমীর আলি তখনকার অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন, তিনি স্যর বার্ণেস পিকককে বলিয়া কহিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, তিনি স্যর বার্ণেসের এজলাসে উর্দ্দুতে সওয়াল জবাব করিতে পারিবেন এবং তাঁহার উর্দ্দু সওয়াল-জবাব দোভাষী ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া বিচারপতিগণকে শুনাইতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা অধিক দিন চলে নাই। অল্প দিনের মধ্যেই হাইকোর্টের বিচারপতিরা এই প্রথা উঠাইয়া দিলেন। ব্যারিষ্টার-

জজদিগের এজলাসে উকীলগণকে কেবল ইংরেজীতেই সওয়াল-জবাব করিতে হইত। তবে অন্যান্য জজদিগের অর্থাৎ সিভিলিয়ান-জজদিগের এজলাসে আরও কিছুদিন উর্দ্দুতে সওয়াল জবাব চলিয়াছিল; কেবল যে সকল উকিল ইংরেজী ভাষায় তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না, সেই সকল উকীলকেই উর্দ্দুতে সওয়াল জবাব করিতে দেওয়া হইত। কিন্তু এই প্রথাও শীঘ্র উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে এই হইল যে, মুন্সী আমির আলি, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এবং অন্যান্য উর্দ্দু ভাষায় অভিজ্ঞ উকীলগণের পশার খুবই কমিয়া গেল এবং বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র, বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্রীনাথ দাস প্রভৃতি ইংরেজীতে অভিজ্ঞ উকীলগণের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল অর্থাৎ তাঁহাদিগের পশার-প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। লক্ষ্ণৌ নগরীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই তাঁহার শিক্ষালাভ হয়। প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালতের ইনি কেরাণী ছিলেন। সিনিয়র উকীল-সরকার বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যুকালে তিনি জুনিয়র সরকারী-উকীল ছিলেন; ফৌজদারী আপীল-মামলায় তাঁহাকে সরকার-পক্ষে দাঁড়াইয়া মামলা চালাইতে হইত। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হইলে তিনি সরকারী-উকীল নিযুক্ত হয়েন। বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় জুনিয়র সরকারী-উকিলের পদ পান। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু-সময় হইতে বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ওকালতীর আয় মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা ছিল। কতকগুলি বড় বড় উকীল ইংরেজী ভাষায়

অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পশার কমিয়া গিয়াছিল বলিয়াই শম্ভুনাথ বাবুর পশার এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। শম্ভুনাথ বাবু যোগ্য, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার যেমন তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ছিল, সেইরূপ সহানুভূতি-প্রবণ উদার হৃদয়ও ছিল। উচ্চনীচ সকলের প্রতিই তিনি ভদ্র ব্যবহার করিতেন। স্যর বার্ণেস পিককের সুপারিশে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। স্যর বার্ণেস শম্ভুনাথ বাবুর যোগ্যতা এবং ঔচিত্যপূর্ণ যুক্তির সহিত আত্মপক্ষ-সমর্থন-প্রয়াস দেখিয়া তাঁহার অনুরাগী হইয়াছিলেন। শম্ভুনাথ বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে সকল শ্রেণীর লোকই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং সকলেই বলিয়াছিলেন,—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচন আর হইতে পারিত না। শম্ভুনাথ বাবুর বিপুল পশার হইয়াছিল এবং হাইকোর্টের জজ হইয়া তাঁহার পদ বৃদ্ধি পাইয়াছিল,—তথাপি তিনি বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মত প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে তিনি কোনও ইউরোপীয় রাজপুরুষ বা জজদিগের সহিত দেখা করিতেন না।

বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পরই মিষ্টার আর-টি এলেনের পশার-প্রতিপত্তি ছিল। তিনি প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী ছিলেন। পরে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ও হাইকোর্টে ওকালতি করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। উকীল-হিসাবে তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা ও নৈপুণ্য ছিল এবং সকলের প্রতিই তিনি শিষ্ট ও ভদ্র করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ মক্কেলই ইউরোপীয় নীলকর ও জমিদার ছিলেন; বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে তাঁহাদের জমিদারী ও নীলের আবাদ ছিল। ইউরোপীয়গণের মামলা তাঁহার একচেটিয়া ছিল।

কৃষ্ণকিশোর ঘোষ

অতঃপর উকীলবাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমে ইঁহার পশার-প্রতিপত্তি প্রায় বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মতই ছিল; সদর দেওয়ানী আদালতে বরং ইঁহার পশার শম্ভুনাথ বাবুর অপেক্ষাও অধিক ছিল। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাঁহার ভাল অধিকার না থাকায় সওয়াল জবাব প্রভৃতি ইংরেজীতে করিতে পারিতেন না বলিয়া হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার পশার অত্যন্ত কমিয়া যায়। পরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহার স্থলে সিনিয়র উকীল-সরকার নিযুক্ত হন। সদর দেওয়ানী আদালতে সিভিলিয়ান জজেরা—বিশেষতঃ বিচারপতি মিষ্টার ট্রেভর তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়াই ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপ না জানিয়াও তিনি সিনিয়র উকীল-সরকারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসার কথা এই যে, সেই পরিণত বয়সে তিনি বাড়ীতে কঠিন পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী ভাষা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কোনও প্রকারে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তাঁহার বক্তব্য তিনি জজদিগকে বুঝাইতেন—মধ্যে মধ্যে উহাতে বাঙ্গালা বুকনিও থাকিত। শেষে গবর্ণমেণ্টের মামলাই তিনি করিতেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার ভদ্রতা ও সহৃদয়তাও যথেষ্ট ছিল। চন্দ্রমাধব বাবুকে তিনি ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে কৃষ্ণকিশোর বাবুর উচ্চ ধারণাই ছিল। যখনই তাঁহার হাতে কোনও মামলা পড়িত—সে মামলা হাইকোর্টেই হউক বা মফঃস্বল আদালতেই হউক, তিনি সেই মামলায় চন্দ্রমাধব বাবুকে নিযুক্ত করিতেন এবং বলিতেন—এই মামলা চন্দ্রমাধববাবু তাঁহার হইয়া চালাইবেন। কৃষ্ণকিশোর বাবুর নিকট হইতে এইরূপ দুইটী

মামলা চন্দ্রমাধব বাবু পাইয়াছিলেন এবং তুইটী মামলাই তিনি তাঁহার হইয়া জিতিয়া দিয়াছিলেন।

মুন্সী আমীর আলি

উকীল মুন্সী আমির আলি ছিলেন বিহারী মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি অনর্গল চমৎকার উর্দ্দ বলিতে পারিতেন। সত্যই সে সময়ে তাঁহার তুল্য উৎকৃষ্ট উর্দ্দু-ভাষী উকীল আর কেহ ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন। বিহার হইতেই তাঁহার অধিকাংশ মামলা আসিত। কিন্তু হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার পরে যখন উর্দ্দতে সওয়াল-জবাব উঠিয়া গেল, তখন তাঁহার পশার একেবারে কমিয়া আসিল। এমন কি, শেষে তাঁহাকে ওকালতীতে ইস্তফা দিয়া মেটিয়াবুরুজে অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব নবাবের মরদ্-উল্ মোহমন বা প্রধানতম কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

দ্বারিকানাথ মিত্র

ইহার পর উকীল-হিসাবে বাবু দ্বারিকানাথ মিত্রের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। লোকে তাঁহাকে প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ বলিয়াই মনে করিত। ইংরেজী ভাষায় ইহার প্রভূত অধিকার ছিল এবং উৎকৃষ্ট ইংরাজীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। এক কথায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইনি ইংরাজীতে বাগ্মী ছিলেন। এইজন্য আদালতে ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু যখন বহুবাজারে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময়ে দ্বারিকানাথ বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। দ্বারিকা বাবু সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম .কিছুদিন তাঁহার ওকালতীতে বিশেষ

সুবিধা হয় নাই। তিনি মধ্যে মধ্যে মামলার বাঙ্গালা নথিপত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দিতেন। তিনি দুই একবার চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট নৈরাশ্যপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ওকালতীতে তিনি উন্নতির বিশেষ আশা দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দ্বারিকানাথ উদারচেতা, করুণহৃদয় ভদ্রলোক ছিলেন, বিপন্ন ব্যক্তিকে বিশেষতঃ পীড়িত ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে সাহায্য তিনি সততই করিতেন। একবার চন্দ্রমাধব বাবু ও দ্বারিকাবাবু পূজার ছুটীতে মুঙ্গেরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থান করিবার সময়ে একজন দুঃস্থ বাঙ্গালী ভদ্রলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হয়েন। ইনি দ্বারিকাবাবুর আত্মীয় কুটুম্ব নহেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু দ্বারিকাবাবুর যখনই শুনিলেন যে, এক ব্যক্তি ওলাউঠা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তখনই তিনি ঔষধাদি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন। ইহাতে লোকটী বাঁচিয়া যান। আর একবার জামালপুর রেলওয়ে অফিসের একজন বাঙ্গালী কেরাণীকে একজন ইউরোপীয় প্রহার করিয়াছিল। কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অনুরোধে দ্বারিকা বাবু পারিশ্রমিক না লইয়া এই কেরাণীর পক্ষাবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ফলে ইউরোপীয় আসামীকে বাঙ্গালী কেরাণীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। শম্ভুনাথবাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর হইতেই দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়ের পশার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাঁহার ওকালতীর আয় শম্ভুনাথ বাবুর মত না হইলেও উহার কাছাকাছি হইয়া উঠে।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইহার পরবর্ত্তী উকীলের নাম বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যখন

চন্দ্রমাধব বাবু সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন সেই সময়ে তাঁহার সহিত অনুকূলবাবুর পরিচয় ছিল না। কিন্তু ক্রমে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব হয়। তখন চন্দ্রমাধব বাবু বুঝিতে পারেন যে, অনুকূলবাবু প্রকৃতই সজ্জন ব্যক্তি। উকীল-হিসাবে তাঁহার যোগ্যতা উচ্চাঙ্গেরই ছিল এবং তিনি অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত মামলা পরিচালন করিতেন। হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার পর তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং তৎপরে তিনি সিনিয়র উকীল-সরকার নিযুক্ত হয়েন। পরিশেষে তিনি হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতিও নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু একবৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে চন্দ্রমাধব বাবুর অত্যন্ত ক্ষতি হয়; কারণ তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর উকীল বাবু অন্নদাপ্রসাদের নাম উল্লেখ করিতে হয়। যখন চন্দ্রমাধব বাবু সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হয়েন সে সময়ে অন্নদাপ্রসাদবাবুর সহিত তাঁহার জানাশুনা ছিল না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের উভয়ে পরিচয় হয়। অন্নদাবাবু উন্নতচরিত্র ও উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভদ্রতার আদর্শ ছিলেন। প্রথমে তিনি কোনও সরকারী আফিসে কর্ম্ম করিতেন; পরে শম্ভুনাথ বাবুর পরামর্শে তিনি সেই কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হয়েন। প্রথম প্রথম শম্ভুনাথ বাবু তাঁহাকে খুবই সাহায্য করিতেন; কারণ তিনি অন্নদাবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার পর অন্নদা বাবুর পশার খুবই বৃদ্ধি পায় এবং যখন সিনিয়র উকীল-সরকার অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েন, সেই সময়ে অন্নদাবাবু হাইকোর্টের সিনিয়র উকীল-সরকার নিযুক্ত হয়েন।

চন্দ্রমাধব বাবু ইঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। অন্নদাবাবু চন্দ্রমাধব বাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। অন্নদাবাবুর পুত্র বাবু অবিনাশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল।

শ্রীনাথ দাস

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরেই উকীল শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা উচিত। ইনি যখন হিন্দু কলেজে পড়িতেন তখন গণিতশাস্ত্রে প্রভূত পারদর্শী বলিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কমিটি পরীক্ষা (Committee Examination) দিয়া শ্রীনাথ বাবু ও বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হয়েন। ইঁহাদের যখন সদর দেওয়ানী আদালতে কয়েক বৎসর ওকালতী করা হইয়াছে সেই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু তথাকার উকীল হইয়াছিলেন। শ্রীনাথ দাস মহাশয় প্রভূত ধীশক্তিসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং হাইকোর্ট-স্থাপনের অল্পদিন পরেই ইঁহার খুবই পশার হয়। ইঁহার যোগ্যতা সমধিক থাকিলেও ইনি শ্রমকাতর ছিলেন। উকীল বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ও ইঁহার অন্যান্য সতীর্থ উকীল যেরূপ পরিশ্রমী ছিলেন, ইনি সেরূপ ছিলেন না। ইঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আদালতে মামলা পরিচালন করিতেন। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে ইঁহার ভুল হইত; জজেরা মনে করিতেন—ইনি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদিগকে ভুল বুঝাইবার জন্য ভুল করিতেছেন। ইনি বড় মধুরপ্রকৃতি ও সদয়-হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন এবং কোনও কারণেই শিষ্টাচার বর্জ্জন করিতেন না। কখনও কোনও জজ যদি ইঁহার উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা অসাধারণ ধৈর্য-সহকারে সহ্য করিয়া যাইতেন। মকদ্দমা বুঝাইবার সময়ে ভুল কথা

বলিবার জন্য সময়ে সময়ে জজদিগের নিকট হইতে তাঁহাকে কঠোর মন্তব্য শুনিতে হইত। জজেরা বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ উকীলগণের সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, শ্রীনাথ বাবুর সম্বন্ধে তাঁহারা সেরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। কিন্তু শ্রীনাথ বাবুর যোগ্যতা ও ধীশক্তি যে যথেষ্ট ছিল ইহা জজেরা জানিতেন। স্তর বার্ণেস পিকক শ্রীনাথ বাবুর মেধা ও মনীষার প্রশংসা করিতেন এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়ের পরিবর্ত্তে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদ শ্রীনাথ বাবুকে দিবার জন্য সুপারিশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপরে কোনও কোনও বিষয়ে নির্ভর করিতে না পারায় তাঁহাকে তিনি উক্ত পদের জন্য সুপারিশ করিতে পারেন নাই। শ্রীনাথ বাবুর সম্বন্ধে চন্দ্রমাধব বাবুর ধারণা কিন্তু অন্যপ্রকার ছিল। শ্রীনাথ বাবু যে ইচ্ছা করিয়া মামলার বিবৃতিতে ভুল করিতেন; ইহা তিনি মনে করিতেন না। শ্রীনাথ বাবু মামলার নথিপত্র একবার মাত্র পড়িতেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মামলার শুনানীর সময়ে তিনি মামলার সম্পূর্ণ বিবরণ আদালতে বিবৃত করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার এই বিশ্বাস সকল সময়ে সত্য হইত না; মামলার বিবৃতিতে কখনও কখনও তিনি ভুলও করিয়া ফেলিতেন। তিনি বড় আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ ও সেই সকল উপলক্ষে আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা, খাওয়ান-দাওয়ান হইত। তখনকার কালে উকীলদের মধ্যে একমাত্র শ্রীনাথ বাবুই বাটীতে সকলের অপেক্ষা পূজা ও উৎসব বেশী করিতেন ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণকে ভোজ দিতেন। তাঁহার বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণ ও অন্যান্য ক্রিয়া উপলক্ষে যাত্রা, কবি, বাইনাচ ইত্যাদি খুবই হইত।

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়

যখন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে বাবু জগদানন্দ

মুখোপাধ্যায় সিনিয়র উকীলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাইকোর্টের জজ হইলে পর তিনি জুনিয়র উকীল-সরকারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উপরে উল্লিখিত উকীলগণের মত অত অধিক পশার তাঁহার ছিল না; কিন্তু তাঁহার কতকগুলি বড় বড় রাজা ও জমিদার মক্কেল ছিলেন; তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি মোটা মোটা ফি পাইতেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার উপর উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষগণের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় এবং তিনিও তাঁহাদিগকে তাঁহার ভবানীপুর-বকুলবাগান-স্থিত প্রাসাদতুল্য বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতেন ভোজ দিয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জগদানন্দ বাবু তাঁহাকে ও তদীয় মহিষীকে তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। একমাত্র জগদানন্দ বাবুর বাটী ব্যতীত ভারতে অবস্থান-কালে যুবরাজ আর কোনও সাধারণ ভদ্রলোকের বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পদার্পণ করেন নাই।

অতঃপর মিষ্টার আর-ই টুইডেল নামক উকীলের নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইনি ইউরেশিয়ান ছিলেন। ইঁহার শরীরের বাঁধন বেশ ছিল। ইনি বেশ ভাল লোক ছিলেন এবং ভদ্রতায় কাহারও চেয়ে কম ছিলেন না। ইঁহার হৃদয়টীও ছিল করুণ। ইনি বুদ্ধিমান ছিলেন এবং মামলার নথিপত্র খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়া লইয়া মামলা বুঝিয়া লইতেন ও উহার মধ্যে কি কি তথ্য আছে সে সবও বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইত না। চন্দ্রমাধব বাবু যখন সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হয়েন, সেই সময়ে টুইডেল সাহেবের বেশী পশার ছিল না। ক্রমে তাঁহার পশার বাড়িয়া উঠে এবং কিছুদিন তাঁহার অত্যন্ত পশার ছিল। তিনি যে খুব যোগ্য লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি কাজ যাহা করিতেন ভালই করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুর

সহিত টুইডেল সাহেবের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতেন। টুইডেল সাহেব ইংলণ্ডে গিয়া বিবাহ করেন এবং তথা হইতে তাঁহার পত্নীকে এখানে লইয়া আসেন। ইঁহারা স্বামী স্ত্রীতে বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিলেন; তার পর টুইডেল সাহেবের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র মিত্র

রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত ইঁহার পূর্ণ পরিচয় ছিল। রমেশচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। আদালতে এবং আদালতের বাহিরে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত ইঁহার নিত্য দেখা-শুনা হইত। রমেশবাবু নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। প্রথম প্রথম ওকালতিতে তাঁহার পশার হয় নাই। কয়েকটী মামলায় চন্দ্রমাধব বাবু রমেশবাবুকে জুনিয়র বা সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে রমেশবাবু তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অতি মূল্যবান। ইহার অল্পদিন পরে তাঁহার যোগ্যতার বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকজন মোক্তারের দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তাঁহারা বিশেষতঃ মোক্তার বাবু বীরেশ্বর দাস তাঁহাকে প্রায়ই মামলা দিতে থাকেন। এইরূপে রমেশ বাবুর পশার বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও ক্রমে তাঁহার পশার খুব বেশী হয়।

কালীমোহন দাস

হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরেই বাবু কালীমোহন দাস

বরিশাল হইতে আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কয় বৎসর ধরিয়া কালীমোহন বাবুর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর এই লইয়া অত্যন্ত প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে যে, পূর্ব্ববঙ্গের মামলা কাহার হাতে কত অধিক আসে। চন্দ্রমাধব বাবু এবং কালীমোহনবাবু উভয়েই ঢাকা জেলার লোক, বিশেষতঃ কালীমোহনবাবু ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ মোক্তার বাবু বীরেশ্বর দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কালীমোহন বাবু সুবক্তা এবং তেজস্বী ছিলেন; যথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিতেন। মক্কেলের পক্ষ-সমর্থনে নির্ভীকতার পরিচয় দিবার প্রয়োজন হইলে সে পরিচয়ও দিতেন, অনেক সময়ে উত্তেজনার বশে তিনি বিবেচনা-শূন্য হইয়া কার্য্য করিতেন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার এক বৎসর পরে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল হয়েন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ ছিলেন, পরে মুন্সেফী ছাড়িয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালতীতে তাঁহারও বেশ পশার হইয়াছিল। ওকালতী আরম্ভ করিবার সময়ে হেমবাবুকে চন্দ্রমাধব বাবু কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু, বাবু কালীকৃষ্ণ সেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর কলেজের অন্যান্য সহপাঠিগণ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন বটে, কিন্তু খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই; তবে তাঁহাদের মন্দ পশার ছিল না।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা আমাশয় রোগে সঙ্কটাপন্নরূপে আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মস্থল খুলনা হইতে ভবানীপুরে আগমন করেন। সেই সময়ে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ পীতাম্বর সেন কলিকাতায় কবিরাজি করিতেছিলেন, তাঁহারই হাতে চন্দ্রমাধব

বাবুর পিতার চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করা হয়। চন্দ্রমাধব বাবু প্রাণপণে পিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন। পরে তাঁহার পিতা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য হয় মুঙ্গের না হয় শ্রীরামপুরে গমন করেন। ঠিক কোন্ জায়গায় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই।

নভেম্বর মাসে চন্দ্রমাধব বাবুর পরিবারবর্গ বিক্রমপুর হইতে ভবানীপুরে আইসেন। চন্দ্রমাধব বাবু তখন ভবানীপুর কাঁসারীপাড়ায় বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী ভাড়া লয়েন। চন্দ্রমাধব বাবু সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হইবার দশ মাসের মধ্যে তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে পর ছয় মাসের মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবুর ওকালতীর আয় মাসিক পাঁচশত টাকা হইয়াছিল। অতঃপর ক্রমেই তাঁহার পশার বাড়িতে থাকে। কেবল পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই যে তিনি বিস্তর মামলা পাইতেন তাহা নহে, পশ্চিম-বঙ্গ ও বিহার হইতেও তিনি বহু মামলা পাইতেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাঁহার পশার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনটী কারণে তাঁহার এরূপ দ্রুত সাফল্যলাভ হইয়াছিল। প্রথম কারণ—তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন, প্রায় প্রত্যহ রাত্রি একটা পর্য্যন্ত তিনি মামলার নথী ও তৎসংক্রান্ত আইন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মামলাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়িতেন না; দ্বিতীয় কারণ—ইংরেজী ভাষায় তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল বলিয়া তিনি উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনর্গল বলিতে পারিতেন এবং সেইজন্য মামলার বিষয় জজদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে সমর্থ হইতেন; তৃতীয় কারণ—আদালতে যখন তিনি মামলার বিবৃতি করিতেন তখন সেই বিবৃতি যাহাতে স্পষ্ট এবং সত্য হয় সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেন; তাঁহার সওয়াল জবাবেও তিনি কাপট্য পরিহার

করিতেন। শুনা যায়, হাইকোর্টে তিনি যেরূপ দ্রুত সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। কোনও উকীলই তাঁহার মত এত শীঘ্র উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে পারেন নাই।

তদানীন্তন ব্যারিষ্টারগণ

সদর দেওয়ানী আদালতে এবং হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার পর হাইকোর্টে যে সকল ব্যারিষ্টার ব্যারিষ্টারী করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সদর দেওয়ানী আদালত যে বাড়ীতে বসিত সেখানে ব্যারিষ্টারদের জন্য বসিবার ঘর ছিল না; সেইজন্য উকীলদের লাইব্রেরী ঘরের অতি নিকটেই ব্যারিষ্টারদের জন্য একটী ঘর দেওয়া হইয়াছিল। এই ঘরে যে সকল ব্যারিষ্টার আপীল বিভাগে মামলা করিতে আসিতেন - তাঁহারাই বসিতেন। এডভোকেট-জেনারেল মিষ্টার রিচি, মিষ্টার লংভিল ক্লার্ক, মিষ্টার পিটারসন, মিষ্টার মণ্ট্রীয়ো এবং আরও ২।৩ জন ব্যারিষ্টার ঐ ঘরে বসিতেন। তাঁহারা প্রায়ই "রিভিউ" মামলায় নিযুক্ত হইতেন। হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার পর নিম্নলিখিত ব্যারিষ্টারগণ যোগদান করেন —মিষ্টার কাউই, মিষ্টার ডয়েন, মিষ্টার পল (পরে স্যার চর্লস পল), মিষ্টার উডরফ, মিষ্টার পিট-কেনেডি, মিষ্টার ইভান্স, মিষ্টার পিউ, মিষ্টার ফিলিপ্‌স, মিষ্টার ককরেন এবং আরও কয়েকজন। ইঁহারা সকলেই আপীল-বিভাগে দাঁড়াইতেন; চন্দ্রমাধব বাবুও আপীল বিভাগে মামলা লইয়া দাঁড়াইতেন। আপীল-বিভাগ হাইকোর্টের জন্য প্রস্তুত নূতন বাড়ীতে উঠিয়া না আসা পর্য্যন্ত ইঁহাদের পশার বৃদ্ধি পায় নাই। মিষ্টার রিচি ব্যবহারশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাকে পরে বড়লাটের ব্যবস্থা-সচিব নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

মিষ্টার লংভিল ক্লার্কও আইনে পারদর্শী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সুবক্তা ছিলেন।

পিটারসন সাহেব ফৌজদারীতে খুব ভাল ব্যারিষ্টার ছিলেন। সময়ে সময়ে ইনি দেওয়ানী মামলাও লইতেন। এই ভদ্রলোকের হৃদয় অত্যন্ত উচ্চ ছিল। চন্দ্রমাধব বাবু যখন জুনিয়র ছিলেন তখনও তাঁহার সম্বন্ধে পিটারসন সাহেবের উচ্চ ধারণা ছিল। একবার চব্বিশ পরগণার তদানীন্তন জেলা-জজ বোফোর্ট সাহেবের এজলাসে চন্দ্রমাধব বাবু মণ্টিুয়ো সাহেবের সহিত একটী মামলায় দাঁড়াইযাছিলেন। মণ্টিুয়ো সাহেবের সওয়াল জবাবের পর চন্দ্রমাধব বাবুও সওয়াল জবাব করেন। পিটারসন সাহেব তাঁহাদের সওয়াল জবাবের উত্তর দিবার সময়ে প্রকাশ্য আদালতে চন্দ্রমাধব বাবুর প্রশংসা করেন। পিটারসন সাহেব ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হয়েন; কিন্তু বেশী দিন তিনি এই পদে কার্য্য করেন নাই; ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যারিষ্টার মণ্টিুয়ো সাহেব ব্যবহারশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি উচ্চদরের বক্তা এবং অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেন সেই সময়ে মণ্টিুয়ো সাহেব সুপ্রীম কোর্টের অস্থায়ী ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলর ছিলেন। কিন্তু জজদিগের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত না বলিয়া যখন দ্বিতীয় বার ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলের পদ খালি হয়, সেই সময়ে তাঁহাকে উক্ত পদে পুনরায় নিযুক্ত করা হয় নাই। সদর দেওয়ানী আদালতের ও হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা তাঁহার প্রগাঢ়-আইন-জ্ঞান ও উদার-চিত্ততার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। জজ এবং উকীলেরা মণ্টিুয়ো সাহেবের অনুরাগী ছিলেন না, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—

তিনি সামান্য কারণেই রাগিয়া উঠিতেন এবং খামখেয়ালী ছিলেন। সেইজন্য পশারও তিনি জমাইতে পারেন নাই। সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা সাদা মসলিনের চাপকান পরিতেন বলিয়া মণ্ট্রিয়ো সাহেব তাঁহাদিগকে বলিতেন—'Babies in linen' বা পোষাকপরা শিশুর দল। চন্দ্রমাধব বাবুকে কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সাধ্যমত তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। প্রকৃত পক্ষে মণ্ট্রিয়ো সাহেব তাঁহার সম্বন্ধু ছিলেন। মণ্ট্রিয়ো সাহেব শেষ বয়সে দুরবস্থায় পতিত হয়েন, এমন কি মৃত্যুকালে তাঁহার এক কপর্দ্দকও ছিল না। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত খরচ চন্দ্রমাধব বাবু প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টার কাউই সাহেবের প্রগাঢ় আইন-জ্ঞান ছিল। কয়েক বৎসর তিনি এডভোকেট-জেনারেলের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিচারপতি এবং উকীল-ব্যারিষ্টারগণ তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন।

ব্যারিষ্টার মিষ্টার জন ককরেণ বড়ই শিষ্টাচারপরায়ণ এবং রসভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চমৎকার বলিতে কহিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারীতে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। একবার তিনি কোনও একজন জজ সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"he has neither brain nor balls, and is like a cow which does not give milk but only kicks." অর্থাৎ তাঁহার না আছে মাথা, না আছে চোক; যে গরু দুধ দেয় না কেবল চাট মারে তিনি উহারই মত।

মিষ্টার আর-ভি ডয়েন শক্তিশালী ও শ্রমশীল ব্যারিষ্টার ছিলেন। যে সকল মামলায় আইনের সূক্ষ্ম তর্ক না উঠিত, কেবল ঘটনার জটিলতা তর্কের বিষয়ীভূত হইত—সেই সকল মামলায় তিনি অপরের অপেক্ষা পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতেন। ব্যারিষ্টারদের মধ্যে তাঁহার পশার সকলের চেয়ে বেশী ছিল। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে ব্যারিষ্টার মিষ্টার

পল ও ব্যারিষ্টার মিষ্টার উডরফ তাঁহার মত পশারওয়ালা হইয়া উঠেন।

মিষ্টার চার্লস পল প্রতিভাশালী ব্যারিষ্টার ছিলেন, কিন্তু ডয়েন সাহেবের মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। তিনি প্রথমে হাইকোর্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিলর নিযুক্ত হয়েন; তৎপরে হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতির পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়; অবশেষে তিনি এডভোকেট-জেনারেলও হয়েন। এডভোকেট-জেনারেলের পদে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি 'স্যর' উপাধি লাভ করেন। আপীল-বিভাগে মিষ্টার ডয়েনের পরেই স্যর চার্লস্ পলের পশার ছিল।

তখনকার কালে মিষ্টার জে-টি উডরফের মত পরিশ্রমী ব্যারিষ্টার আর কেহ ছিলেন না। মামলার নথি তিনি এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িতেন যে, সমস্ত ঘটনাই তাঁহার নখদর্পণে থাকিত। এইজন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যে কোনও উকীল বা ব্যারিষ্টার দাঁড়াইতেন, তাঁহাকেও পূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইতে হইত। কারণ, পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া না দাঁড়াইলে তাঁহার হাতে রক্ষা ছিল না, প্রতিপক্ষ উকীল বা ব্যারিষ্টারকে হারিতে বা অপ্রস্তুত হইতে হইত। ব্যারিষ্টার উডরফ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবু সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। একবার বিচারপতি মিষ্টার লুইস জ্যাকসনের এজলাসে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত একটি জটিল মামলা বিচারাধীন ছিল। ভাগলপুরের বাবু সূর্য্যনারায়ণ সিংহ এই মামলাটীর তদ্বিরকার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্যারিষ্টার উডরফ তখন ইংলণ্ডে। সূর্য্যনারায়ণ বাবু তাঁহাকে ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহেন যে, যে ব্যারিষ্টার এই মামলায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কোন্ উকীলকে নিযুক্ত করা উচিত? ইহার উত্তরে উডরফ সাহেব লিখেন যে, চন্দ্রমাধব বাবুকেই নিযুক্ত করা উচিত। উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় উক্ত জজের প্রিয়পাত্র বলিয়া

এবং তাঁহার উপর মোহিনী বাবুর প্রভূত প্রভাবও ছিল বলিয়া লোকে বলিত ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও চন্দ্রমাধব বাবুকে উডরফ সাহেব মনোনীত করিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের আইনে প্রভূত অধিকার ছিল এবং লোকও ছিলেন খুব ভাল। তবে তাঁহার বক্তৃতার বা বলিবার ধারা ভাল ছিল না। তিনি কিছুদিন অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টে জজীয়তী করিয়াছিলেন।

মিষ্টার গ্রিফিথ ইভান্স সুগভীর আইন-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁহার হাতে যে মামলা পড়িত সেই মামলার নথিপত্র তিনি আগাগোড়া ভাল করিয়া পড়িতেন—খুঁটিনাটী কিছুই বাদ দিতেন না। তখনকার কালে তাঁহার পশার কোনও ব্যারিষ্টার অপেক্ষা কম ছিল না। জজেরা তাঁহাকে যেমন বিশ্বাস তেমনি খাতিরও করিতেন। এমন কি, গবর্মেণ্টও তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির করিতেন। ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না সেইজন্য ভারতীয়গণ তাঁহাকে খাঁটি এংলো-ইণ্ডিয়ান বলিতেন। প্রায় ২০ বৎসর কাল তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন এবং সদস্য থাকিবার সময়েই তিনি কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন।

ব্যারিষ্টার মিষ্টার এল-পি পিউ স্যর গ্রিফিথ ইভান্সের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি যেমন সদাশয় ছিলেন তেমনই তাঁহার হৃদয়ও ছিল উচ্চ। তিনি ইভান্স সাহেবের মত কৃতী ও পণ্ডিত ছিলেন না বলিয়া ব্যারিষ্টারীতে সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। পিউ সাহেব ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতার মত গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার খাতির ছিল না। পিউ সাহেবের পত্নীও সদাশয়া ও দয়ার্দ্রহৃদয়া ছিলেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর পরিবারস্থ মহিলাগণের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল।

পিউ সাহেব বৃদ্ধ বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকল শ্রেণীর লোকই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টার মিষ্টার ফিলিপ্সের নাম আরও পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল। তিনি যেমন ভাল লোক ছিলেন, তেমনই আইনও তিনি উত্তমরূপ জানিতেন। ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহার প্রভূত অধিকারের জন্য তিনি সতীর্থগণের সম্মানার্হ ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার অল্প দিন পরেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং দেশে চলিয়া যান। ইহার বহু বৎসর পরে—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় 'স্যর' উপাধি লাভ করিলে তিনি ইংলণ্ড হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া পত্র লিখেন এবং সেই পত্রে তাঁহার প্রভূত প্রশংসাবাদ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই পত্র চন্দ্রমাধব বাবুর প্রীতির কারণ হইয়াছিল।

হাইকোর্টে বিস্তর মামলা জমিয়াছিল এবং বিচারপতিগণের সংখ্যায় অল্পতার জন্য সেগুলির বিচার যথাসময়ে করিয়া উঠা যাইতেছিল না বলিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন নূতন বিচারপতির নিয়োগ হয়। তাঁহাদিগের নাম—(১) মিষ্টার ই-পি লেভিঞ্জ; (২) মিষ্টার এ-এ রবার্টস; (৩) মিষ্টার ই জ্যাকসন; (৪) মিষ্টার ডব্লিউ-এস সেটন-কার; (৫) মিষ্টার জে-পি নরম্যান; (৬) মিষ্টার ডব্লিউ মরগ্যান, (৭) বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত; (৮) মিষ্টার লুইস জ্যাকসন এবং (৯) মিষ্টার জর্জ্জ ক্যাম্বেল।

বিচারপতি লেভিঞ্জ সাহেব ভাল আইনজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই সকলে মনে করিত; কিন্তু বিচারকার্য্যে, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা প্রকট হয় নাই। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

বিচারপতি মিষ্টার রবার্টস বেশীদিন কাজ করেন নাই; তিনি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বিচারপতি মিষ্টার জাকসন অত্যন্ত সদাশয়, ভদ্র ও বিবেকবুদ্ধি-

সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু বিচারকার্য্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়া নাম করিতে পারেন নাই।

বিচারপতি মিষ্টার সেটন-কার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকারে ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন মন্দ নহে; কোনও বাঙ্গালী তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলে তিনি বাঙ্গালায় তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালায় কথা কহার দিকে তাঁহার ঝোঁক ছিল। জজ হিসাবেই বলুন বা মানুষ হিসাবেই বলুন, কেহ তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জজীয়তীতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। কিন্তু পরে ভারত গবর্মেণ্টের পররাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী হইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার জে-পি নরম্যান প্রকৃতপক্ষে অতীব সদাশয় ও করুণহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় বিবেক বুদ্ধি-চালিত হইয়া কার্য্য করিতেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং সকলের প্রতিই শিষ্ট ব্যবহার করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুর উপর তিনি বড় সদয় ছিলেন এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেন। স্যর বার্ণেস পিকক ছুটী লইলে তিনি কিছুদিন তাঁহার স্থানে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। টাউন-হলের সিঁড়িতে (টাউন-হলে তখন হাইকোর্টের আদিম বিভাগ অবস্থিত ছিল) এক ধর্ম্মান্ধ ওহাবী মুসলমান তাঁহাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

জজ মিষ্টার মরগ্যান (পরে স্যর ওয়াল্টার মরগ্যান) পূর্ব্বে সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটী বিভাগের মাষ্টার (Master of the Equity Side) ছিলেন। হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাইকোর্টে জজীয়তী করিয়াছিলেন। পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের

বিচারপতি (Court Justice) নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে চলিয়া যান। কলিকাতা হাইকোর্টে জজ-হিসাবে তিনি নাম করিতে পারেন নাই। তাঁহার একটী দোষ ছিল—অল্পেই রাগিয়া উঠিতেন। কিন্তু তাঁহার রায়ে এরূপ দোষের পরিচয় পাওয়া যাইত না।

বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবেই বলা হইয়াছে। তিনি হাইকোর্টের জজ হইলে সকল লোকেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল।

বিচারপতি মিষ্টার জ্যাকসন পূর্ব্বে রাজসাহীর জেলা-জজ ছিলেন। উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায় রাজসাহী জেলা-আদালতে ওকালতী করিতেন। তাঁহার সময়ে তিনি হাইকোর্টের সিবিলিয়ান জজদিগের মধ্যে সকলের অপেক্ষা যোগ্য ছিলেন। মামলা বুঝিতে তাঁহার একটুও বিলম্ব হইত না। তিনি সামান্য কারণেই রাগিয়া উঠিতেন এবং জুনিয়র বা নূতন উকীলদের উপর তাঁহার অনুরাগ ছিল না। তাঁহাদের উপর বড় কড়া ব্যবহার করিতেন। তাঁহার নিজেরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি মামলা বুঝিতে পারেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময়ে উকীলকে মামলা বুঝাইবার অবসর না দিয়া নিজেই মামলার বিষয় শেষ করিয়া ফেলিতেন। এইজন্য তিনি প্রত্যহ বৈকাল হইতে না হইতে তাহার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিতেন। ইনি হাইকোর্টে আসিবার অল্পদিন পরেই চন্দ্রমাধব বাবু ইহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একবার একটা বড় রকমের ফৌজদারী আপীল-মামলা চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার এজলাসে চালাইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার উপর জ্যাকসন সাহেবের ভাল ধারণা হইয়াছিল।

জজ জ্যাকসন সাহেবের এজলাসে উকীল বাবু মোহনীমোহন রায় চন্দ্রমাধব বাবুর বিপক্ষে দাঁড়াইলে অনেক সময়ে চন্দ্রমাধব বাবুকে জজের সহিত ঝগড়া করিতে হইত। জ্যাকসন সাহেবের পুত্র

কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জজ জ্যাকসন সাহেবের এজলাসে চন্দ্রমাধব বাবুর বিপক্ষে দাঁড়াইলেও চন্দ্রমাধব বাবুকে জ্যাকসন সাহেবের সহিত ঝগড়া করিতে হইত। কিছুদিন ধরিয়া এমন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল যে, জজ জ্যাকসন সাহেবের এজলাসে মামলাকারীগণ বা তাঁহাদের মোক্তারগণ উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায়কে বা ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেবকে নিযুক্ত করিবে এই লইয়া ভীষণ তর্ক-বিতর্ক করিত; কেহ কেহ বা মোহিনীবাবু ও ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব—দুইজনকেই নিযুক্ত করা সমীচীন মনে করিতেন। হাইকোর্টে এই ব্যাপার লইয়া খুবই জল্পনা-কল্পনা ও গাল-গল্প চলিত। দুঃখের বিষয় ব্যারিষ্টার জ্যাকসন সাহেব অল্পদিন মধ্যেই পরলোক গমন করেন।

বিচারপতি মিষ্টার ক্যাম্বেলের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে মামলার সওয়াল-জবাবের সময়ে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রায়ই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিয়াও তিনি মামলার সমস্ত তথ্য অধিগত করিয়া লইতেন। তিনি চতুর ছিলেন এবং মামলা শীঘ্র বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু যোগ্য ও অভিজ্ঞ বিচারপতি বলিয়া হাইকোর্টে তিনি খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; পরে তিনি বাঙ্গালা দেশের ছোটলাট নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বাবুর তৃতীয় পুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ায় বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আন্দুল-নিবাসী) বাড়ী ভাড়া লইয়া বসবাস করিতেছিলেন। এই বাড়ীতেই সতীশচন্দ্রের জন্ম হয়।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আরও কয়েকজন নূতন জজ হাইকোর্টে নিযুক্ত

হয়েন। তাঁহাদের নাম- মিষ্টার মিল, মিষ্টার স্কট, মিষ্টার পিটারসন, মিষ্টার এ-জি ম্যাকফারসন, মিষ্টার এফ-এ গ্লোভার এবং মিষ্টার জে-বি ফিয়ার।

বিচারপতি মিল সাহেব ও স্কট সাহেব হাইকোর্টের আপীল-বিভাগে ব'সতেন না; সেইজন্য তাঁহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নহে।

বিচারপতি মিষ্টার পিটারসন অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ জজ বলিয়া হাইকোর্টে খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান।

বিচারপতি মিষ্টার এ-জি ম্যাকফারসন (পরে স্যর আর্থার ম্যাকফারসন) যোগ্য ও অভিজ্ঞ বিচারক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। অবসর-গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি হাইকোর্টের সর্ব্বোত্তম বিচারপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভদ্র ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার গ্লোভার বিচারকার্য্যে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই; তবে তিনি সদয়হৃদয় ও ভদ্র ছিলেন।

বিচারপতি মিষ্টার জে-বি ফিয়ার সুযোগ্য এবং তেজস্বী বিচারক ছিলেন। কিন্তু তিনি খুঁটিনাটীর দিকে অত্যন্ত অধিক নজর দিতেন বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহার রায়ে খুঁত থাকিয়া যাইত। তিনি ভদ্র ও দয়ালু ছিলেন; কিন্তু নাম ও খ্যাতির প্রার্থী ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল এবং অনেকে মনে করিত যে, তাঁহার উপর মনোমোহন ঘোষের সমধিক প্রভাব ছিল এবং তাঁহার যুক্তির দিকে তিনি অযথা ঢলিয়া পড়িতেন। এইরূপ ধারণার ফলে বিচারপতি জ্যাকসন সাহেবের এজলাসে মামলা পড়িলে মামলাকারীরা যেমন মোহিনীবাবুকে উকীল নিযুক্ত করিতে

ছুটিত, ফিয়ার সাহেবের এজলাসে মামলা পড়িলে তেমনই ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে মামলাকারীরা নিযুক্ত করিত।

বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী জেলার আন্সা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, ইনি চন্দ্রমাধব বাবুর জনৈক পুরাতন বন্ধু। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রতাপ বাবু চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত বহু বাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসুর পরিচয় করাইয়া দেন। নবীনবাবু কলিকাতার কোনও একটী অফিসের বেনিয়ান ছিলেন। প্রতাপবাবু আর্ম্মি এণ্ড নেভী ক্লোদিং বোর্ডে কর্ম্ম করিতেন। শীঘ্রই নবীনবাবুর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। সেই বন্ধুত্ব বহুকাল—নবীনবাবুর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনবাবু উচ্চমনাঃ ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে অফিসে তিনি বেনিয়ন ছিলেন সেই অফিস ফেল হইয়া যাওয়ায় নবীনবাবু অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়েন এবং তাঁহার অবস্থা নিঃস্ব হইয়া পড়ে; দরিদ্র অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই নবীনবাবুর দ্বারা এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্রের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর পরিচয় হয়। ক্রমে নীলকমলবাবুর সহিতও তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। নীলকমলবাবু খুব ভাল লোক ছিলেন। বাঙ্গালীমাত্রই এলাহাবাদে যাইলে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন—স্বজাতির অতিথি-সৎকারে ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কিন্তু নবীনবাবুর মত তাঁহার হৃদয় উচ্চ ছিল না। নীলকমলবাবু দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দুইটীও ছিল উজ্জ্বল। তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি চতুর ছিলেন। চন্দ্রমাধববাবু বলিতেন, নীলকমলবাবুর মত পরিশ্রমী লোক আর কখনও আমি দেখি নাই। এলাহাবাদ এবং কানপুর জেলায় তাঁহার মদের ভাঁটী ছিল এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি মদ চোলাই করিবার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়াছিলেন। মদ তৈয়ারী ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য ব্যবসায়ও ছিল।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে—হাইকোর্টে পূজার ছুটীতে চন্দ্রমাধব বাবু বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এলাহাবাদে গমন করেন। যমুনার তীরে একটী ছোট দোতালা বাড়ী তিনি থাকিবার জন্য লইয়াছিলেন। এই বাড়ীটির মালিক ছিলেন বাবু নীলকমল মিত্র। এখানে থাকিবার সময়ে তিনি তাঁহার নিকট-আত্মীয় ফরিদপুরের জনৈক পুলিস সাব-ইনস্পেক্টরের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম পান যে, জনৈক চুরির আসামীর নিকট হইতে জোর করিয়া একরার করাইয়া লইবার অপরাধে তিনি দায়রা সোপরদ্দ হইয়াছেন ; তিনি অত্যন্ত বিপন্ন। এই কারণে উক্ত সাব-ইনস্পেক্টর তাঁহার পক্ষ-সমর্থনের জন্য চন্দ্রমাধব বাবুকে ফরিদপুরে আসিবার জন্য তার-যোগে অনুরোধ করিয়াছেন। চন্দ্রমাধব বাবু স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এলাহাবাদে গিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহার নিকট-আত্মীয়কে বিপন্ন দেখিয়া অবিলম্বে ফরিদপুর যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় আসিলেন ; তার পর কলিকাতা হইতে কুষ্ঠিয়া হইয়া ফরিদপুরে পৌছিলেন ; তিনি ফরিদপুরে পৌছিলে উক্ত সাব-ইনস্পেক্টর ও তাঁহার অগ্রজ এবং বাবু ভগবান চন্দ্র বসু-(ইনি স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা এবং ফরিদপুরের তদানীন্তন প্রধান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ভগবান বাবু ও আরও কয়েকজন ভদ্রলোক চন্দ্রমাধববাবুকে বলেন, আপনি এই মামলায় দাঁড়াইবেন না ; কারণ ঢাকা হইতে আগত দায়রা-জজ মিষ্টার এবারক্রমবি—"যিনি দায়রা-আদালতে এই মামলার বিচার করিবেন তাঁহার ধারণা এই যে, কলিকাতা হইতে আগত কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার তাঁহার এজলাসে আসামীর পক্ষ-সমর্থনার্থ উপস্থিত হইলে তিনি সেই উকীল বা ব্যারিষ্টারের প্রতিকূলতা করিতেন এবং মক্কেলের বিরুদ্ধে রায় দিতেন। এবারক্রমবি সাহেবের ধারণা ছিল যে,

আসামী যখন কলিকাতা হইতে উকীল বা ব্যারিষ্টার আনাইয়াছে তখন তাহার মামলায় গলদ আছে এবং সে তাঁহার চক্ষে ধুলি দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রমাধব বাবু অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিস্তর কষ্ট করিয়া তাঁহার আত্মীয়ের উপকার করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার উপস্থিতিতে আত্মীয়ের ক্ষতি হয়, ইহা ত হইতে পারে না। এই জন্য তিনি তাঁহার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ অবস্থায় কি করা যায়? আগামী কল্য মামলার দিন স্থির হইয়াছে—ভাবিবার সময় নাই।" চন্দ্রমাধব বাবুর আত্মীয় বলিলেন—"আমি কাল প্রাতে আপনার কথার উত্তর দিব। কিন্তু আপনি নথিপত্র পড়িয়া মামলা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকুন।" চন্দ্রমাধব বাবু সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মামলাটী ভাল করিয়া পড়িয়া রাখিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আত্মীয়টী আসিয়া বলিলেন—"আমি বেশ করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, আপনিই আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন, ইহাতে ফল যাহাই হউক না কেন? ২ হাজার টাকার কমে আপনার মত একজন উকীল আনিতে পারা যাইত না। তার পর আপনি যখন কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছেন তখন এমন সুযোগ আমি ত্যাগ করিব না। আমার ভাগ্যে যাহা হয় হউক—আপনিই আমার পক্ষ সমর্থন করুন।" কাজেই চন্দ্রমাধব বাবুও তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে ঢাকা জজ-আদালতের প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী গোলাম মুস্তাফা ফরিদপুরে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে মামলা দিতেন। কোনও একটী মামলা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য মৌলবী সাহেব ফরিদপুরে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া

বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে; আমি এখানে আমার এক আত্মীয়ের পক্ষ-সমর্থনের জন্য আসিয়াছি; দায়রা-আদালতে এবারক্রম্‌বি সাহেবের নিকট মামলার বিচার হইবে। আপনাকে এই মামলায় আমার সহিত দাঁড়াইতে হইবে।" মৌলবী সাহেব আনন্দের সহিত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর উভয়েই দায়রা-আদালতে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন,—"সার্কিট হাউসের একটি ছোট ঘরে এজলাস বসিয়াছে। জজের বসিবার জন্য যে উচ্চ বেদী (Platform) থাকে, তাহা ছিল না। দায়রা-জজ এবারক্রম্‌বি সাহেব মেঝেতেই একটী চেয়ার-টেবিল লইয়া বসিয়াছিলেন। দুইটী নীচু রকমের বেতের মোড়া ছিল, উহাদের একটীতে পেস্কার ও অপরটীতে উকীল-সরকার বসিয়াছিলেন। উকীল বা অপর কাহারও বসিবার জন্য কোনও রূপ আসন ছিল না। এইরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখিয়া এবং জজের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া তিনি তাঁহার বন্ধু মৌলবী গোলাম মুস্তাফাকে বলিলেন,—"আপনি আমার উপস্থিতির কথা জজকে বলুন।" মৌলবী সাহেব জজকে হাইকোর্ট হইতে উকীল চন্দ্রমাধব বাবুর উপস্থিতির কথা জানাইলেন। জজ এবারক্রম্‌বি সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর আগমনের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার টেবিলের নিকট আসিলে তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়াই দেখিলেন না। কাজেই চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার বন্ধু মৌলবী সাহেবকে দিয়া তাঁহার আগমনের কথা জজকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জজের নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর আগমনের কথা বলিলে জজ তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং চাপরাসীকে মোড়া আনিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু মোড়া পাওয়া যাইল না; কাজেই তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার নিজের খাস কামরা হইতে দুইখানি চেয়ার আনাইতে হইল। একটী আসিল চন্দ্রমাধব বাবুর জন্য, অপরটী

মৌলবী সাহেবের জন্য। চেয়ার দুইটীতে চন্দ্রমাধব বাবু ও মৌলবী সাহেব উপবেশন করিলেন। জজ সাহেব মধ্যে মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবুর দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অতঃপর মামলার বিচার আরম্ভ হইল। বিচারকার্য্যে সাহায্যের জন্য তিন জন এসেসরও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গোড়াতেই প্রথম সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে উঠিল। যখন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া হইতেছিল, তখন চন্দ্রমাধব বাবু দেখিলেন যে, এক অদ্ভুত পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে। সাক্ষী বাঙ্গালায় দুই এক কথা বলিবামাত্র পেস্কার উহা বাঙ্গালাতেই লিখিয়া লইতেছিলেন, তাহার পর সেই কথাগুলি হিন্দুস্থানীতে ভাষান্তরিত করিয়া জজকে বলিতেছিলেন; জজ ঐগুলি ইংরাজীতে লিখিয়া রাখিতেছিলেন। জজ বাঙ্গালা জানিতেন না বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। গোড়াতেই চন্দ্রমাধব বাবু দেখিলেন যে, পেস্কার সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লইতে ভুল করিতেছেন। চন্দ্রমাধব বাবু এজন্য আপত্তি উত্থাপন করিলেন। জজ তাঁহাকে হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে?" চন্দ্রমাধব বাবু ইংরাজীতে উত্তর করিলেন,—"পেস্কার সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া লইতে ভুল করিতেছেন।" ইহাতে জজ অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আপনি যদি আর একটী কথাও ইংরেজীতে বলেন, তাহা হইলে আমি আপনার জরিমানা করিব।" চন্দ্রমাধব বাবু তখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন—তাঁহার মক্কেলের অদৃষ্ট মন্দ। কিন্তু তিনি সঙ্কল্প করিলেন,—সাহেবের সহিত লড়াই করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার মক্কেলের যাহা হয় হউক। তিন দিন ধরিয়া বিচার চলিয়াছিল। এই তিনদিনই চন্দ্রমাধব বাবুর পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়াছিল। সরকার-পক্ষে প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য শেষ হইলে জজ চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কি ইহাকে জেরা করিতে চান ?" চন্দ্রমাধব বাবু প্রথম সাক্ষীকে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। সাক্ষীকে দুই তিনটী প্রশ্ন করিবার পরই জজ পরবর্ত্তী প্রশ্নে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—"এ প্রশ্ন অনাবশ্যক; আপনি সাক্ষীকে ঘাবড়াইয়া দিবার জন্য এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন।" চন্দ্রমাধব বলিলেন,—"এ প্রশ্ন অত্যন্ত দরকারী এবং ইহা সত্য; তাহা সত্ত্বেও আপনি আপত্তি করিতেছেন কেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।" ইহাতে জজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা বেশ প্রশ্ন করুন।" অতঃপর চন্দ্রমাধব বাবু সাক্ষীকে বিশেষভাবে জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। জজও পূর্ব্বের মত আপত্তি করিতে লাগিলেন। তখন চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন,—"আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি ইহা লিখিয়া লউন; যদি না করিতে দেন, তাহা হইলে লিখিয়া লউন যে, প্রশ্ন করিতে দিলাম না।" ইহাতে জজ তাঁহাকে জেরা করিবার অনুমতি দিলেন। সরকার-পক্ষের প্রত্যেক সাক্ষীরই জেরার সময়ে জজের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর এইরূপ লড়াই হইয়াছিল।

প্রত্যেক সাক্ষীকে জেরা করিবার পর চন্দ্রমাধব বাবু আসন গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে জজ সাহেব তাঁহার দিকে অপরের অলক্ষ্যে আড়চোখে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। সম্ভবতঃ চন্দ্রমাধব বাবু আদালতের অপমাননাকর কোনও কিছু আকার-ইঙ্গিতেও করেন কি না তাহা তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কোনও প্রকার বেচাল দেখিলে তাঁহাকে শাস্তি দিবেন, ইহাই হয় ত তাঁহার অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি এমন ব্যবহার করিবেন না যাহতে জজ সাহেব তাঁহাকে দোষী করিতে পারেন। তিনদিন তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিতে হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের শেষে সরকার-তরফের সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান শেষ হইয়া গেল। পরদিন চন্দ্রমাধব বাবু সওয়াল জবাব করিবেন; সেজন্য

তিনি প্রস্তুত হইলেন। জজ সাহেব বাঙ্গালা বুঝিতেন না এবং তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে ইংরেজীতে সওয়াল জবাব করিতে দিতেও অসম্মত। সেইজন্য চন্দ্রমাধব বাবু জজ সাহেব ও এসেসরগণকে তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবেন কেমন করিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অবশেষে তিনি হিন্দুস্থানীতেই সওয়াল জবাব করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাত্রি প্রায় তিনটা পর্য্যন্ত তিনি জাগিয়া বিশেষ পরিশ্রম-সহকারে প্রয়োজনীয় বক্তব্যগুলি লিখিয়া রাখিলেন এবং সওয়াল জবাবে যে সকল হিন্দুস্থানী শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা মনের ভিতরে জোগাইয়া রাখিতে লাগিলেন। পরদিন আসামীদের তরফের সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য লওয়া হইল। জজ তখন উকীল-সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বলিবার আছে ?" উকীল সরকার বৃদ্ধ, নিতান্ত সেকেলে এবং ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞ। তিনি উঠিয়া কেবল এই কয়টী কথা বলিলেন,—সব-ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবলদের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে ; উহাদিগকে কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত। অতঃপর জজ এবারক্রম্বি সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি বলিবার আছে বলুন। তিনি তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় জজকে বলিলেন,—আমি যদি ইংরেজীতে সওয়াল করি তাহা হইলে আদালতের সুবিধা হয় ও সময় বাঁচে কি না। তাহার পর আমি উহার মর্ম্ম এসেসরগণকে বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিব।" জজ কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন—"এখানে আপনি ও আমি ছাড়া আর কেহ ইংরাজী জানে না ; তবে ইচ্ছা করিলে আপনি বাঙ্গালাতে সওয়াল করিতে পারেন।" চন্দ্রমাধব বুঝিলেন,—বাঙ্গালায় সওয়াল করা পণ্ডশ্রম মাত্র ; কারণ জজ তাহার এক বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিবেন না। কাজেই তিনি জজ সাহেবকে বলিলেন,—"আমি হিন্দুস্থানীতেই সওয়াল করিব।" অতঃপর

চন্দ্রমাধব বাবু সওয়াল আরম্ভ করিলেন। ১০।১২ মিনিট অন্তর একটি করিয়া যুক্তি শেষ করিবামাত্র জজ সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন,—"সওয়াল শেষ হইল কি?" চন্দ্রমাধব বাবু মৃদু হাসিয়া উত্তর করেন,—"আমার আরও অনেক বলিবার আছে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, চন্দ্রমাধব বাবু পৌনে এক ঘণ্টা সওয়াল করিবার ভিতরে জজ সাহেব একবারও তাঁহার সওয়াল হইতে কোনও বিষয় লিখিয়া রাখেন নাই। জজ সাহেব যখন দেখিলেন,—পৌনে এক ঘণ্টাতেও চন্দ্রমাধব বাবুর সওয়াল শেষ হইল না তখন তিনি বুক পকেট হইতে কতকগুলি কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু মনে করিলেন,—জজ সাহেবকে এইবার কায়দায় পাওয়া গিয়াছে, তিনি যত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন এইবার সুদসমেত তাহা ফেরত দেওয়া যাইবে। এই মনে করিয়া তিনি চুপ করিলেন। জজ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি সওয়াল করিয়া যান।" তখন চন্দ্রমাধব বাবু জজকে সম্বোধন করিয়া হিন্দুস্থানীতে বলিলেন—"হুজুর যদি অন্য কাজ করেন, তাহা হইলে আমার সওয়াল জবাব করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।" তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এবং কতকটা উচ্চস্বরে এই কথা কয়টি বলেন। কিন্তু ইহার ফল অদ্ভুত হইল; জজ তখনই তাঁহার হাতের কাগজগুলি রাখিয়া দিলেন এবং দুই মিনিট কাল জড়পদার্থের মত অসাড় ও নীরব হইয়া রহিলেন। অতঃপর চন্দ্রমাধব বাবু সওয়াল জবাব আরম্ভ করিলেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি তখন সওয়ালের প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া রখিতেও লাগিলেন। জজ সাহেব ইহার পর আর চন্দ্রমাধব বাবুকে থামাইবার চেষ্টা করেন নাই। চন্দ্রমাধব বাবুও এই সুযোগে জজ সাহেবকে ও এসেসরগণকে মামলাটী যতদূর সাধ্য বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি এসেসরদিগের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার সওয়াল জবাব

শুনিয়া তাঁহারই পক্ষপাতী হইয়াছেন। এমন কি, এসেসরগণ পরস্পরের মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন সে সকলও শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। তাহাতেও বুঝা যাইতেছিল যে, তাঁহারা আসামীকে নিরপরাধই বলিবেন। অতঃপর চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার সওয়াল শেষ করিলেন এবং উপসংহারে জজসাহেব ও এসেসরগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"আমি আর হুজুরকে ও আপনাদিগকে কষ্ট দিব না; আমার সওয়াল শেষ হইল। আশা করি, আমার সওয়াল জবাব হইতে আমার মক্কেলের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে আপনাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকিবে না।"

চন্দ্রমাধব বাবুর সওয়াল জবাব শেষ হইবার পর জজসাহেব মৌলবী গোলাম মুস্তাফা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" মৌলবী সাহেব তখন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন— "হুজুর! চন্দ্রমাধববাবু হাইকোর্টের একজন বড় উকীল। কাজেই হাইকোর্টে যেরূপ সওয়াল হয় তিনি সেইরূপ সওয়াল করিয়াছেন। আমি হুজুরের আদালতের উকীল—হুজুরের আদালতে যেরূপ সওয়াল হয়, ঐরূপ সওয়াল জবাবই করিতে চাই।" জজ এবারক্রম্বি সাহেব এই কথায় খুবই প্রীত হইয়া বলিলেন—"আপনি সওয়াল করুন।" মৌলবী সাহেব তদনুসারে দুইচারিটী কথা বলিয়াই বসিয়া পড়িলেন। জজ সাহেব এসেসরগণকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আসামীদের সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?" এসেসরগণ তৎক্ষণাৎ উত্তর কলিলেন—"আসামীরা নিরপরাধ; সুতরাং মুক্তি পাইবার অধিকারী।" জজ সাহেব তাঁহাদের এই মন্তব্যে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেকসুর খালাস?" এসেসরগণ উত্তর করিলেন—"হঁা খোদাবন্দ।" জজ সাহেব অতঃপর দুই এক মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর মামলা সম্বন্ধে যে সকল বিষয় টুকিয়া রাখিয়াছিলেন সেইগুলি দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল—আসামীদিগকে শাস্তি

দিতে পারিলেই যেন তিনি খুসী হয়েন। যাহা হউক, জজ সাহেব বলিলেন,—রায় পরে দেওয়া হইবে ; আসামীরা যেমন জামিনে খালাস আছে সেইরূপই থাকিবে। এই বলিয়া তিনি এজলাস ত্যাগ করিলেন। আদালত হইতে বাহিরে আসিবার সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু দেখিলেন,—বহুলোক মামলাটী দেখিবার, তাঁহার সওয়াল জবাব শুনিবার ও মামলার ফল কি হয় তাহা জানিবার জন্য সমবেত হইয়াছে। বাসায় আসিবার সময়ে বহুলোক তাঁহার অনুসরণ করিল ; কারণ, তাহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, ইনি অসম্ভব কার্য্য করিয়াছেন। চন্দ্রমাধব বাবু কিন্তু তাঁহার আত্মীয়কে বলিলেন,—"আপনি জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হউন, তবে একরূপ নিশ্চিত জানিবেন যে, হাইকোর্টে আপীল করিয়া আমি আপনাকে খালাস করিয়া আনিব।"

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা উচিত। যে কয়দিন চন্দ্রমাধব বাবু ফরিদপুরে ছিলেন এবং যে কয়দিন মামলাটী চলিয়াছিল সে কয়দিনই রাত্রিতে কয়েকজন পুলিস কনেষ্টেবল তফাৎ হইতে তাঁহার বাসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল। যে মামলাটীতে আসামী পক্ষ-সমর্থনের জন্য তিনি ফরিদপুরে আসিয়াছিলেন, উহা পুলিশ কর্ত্তৃক রুজু করা মামলা। ইহা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেবের আদেশে রুজু-করা হইয়াছিল। তাঁহারা সব-ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবলদিগকে দণ্ড দেওয়াইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই তাঁহারা কনষ্টেবলদিগকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলেন, চন্দ্রমাধব বাবুর বাসায় আসামীদের তরফে কোনও সাক্ষী যাইতেছে কি না, এবং তাঁহাকে শিখাইয়া-পড়াইয়া লওয়া হইতেছে কি না।

যাহা হউক, চন্দ্রমাধব বাবু বাসায় পৌছিয়া ভাবিলেন—তাঁহার পক্ষে আর এক মুহূর্ত্তও ফরিদপুরে থাকা উচিত নহে। কারণ, থাকিলেই তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়ের প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইবে তাহা শুনিতে

হইবে। দণ্ড যে তাঁহার হইবে, এ ধারণা চন্দ্রমাধব বাবুর মনে বদ্ধমূলই হইয়াছিল। সেই দিন রাত্রিতেই চন্দ্রমাধব বাবু ও তাঁহার বন্ধু মৌলবী সাহেব ঢাকায় রওনা হইলেন। তখন চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা ঢাকার জরিপ বিভাগের ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু ঢাকায় পৌঁছিয়াই টেলিগ্রাম পাইলেন, উহাতে তাঁহার আত্মীয় লিখিয়াছেন,—"আমি ও অন্যান্য আসামী বেকসুর খালাস পাইয়াছি। আপনি ফরিদপুর হইতে চলিয়া যাইবার পরদিনই জজ সাহেব এই রায় দিয়াছেন।" এই সংবাদে চন্দ্রমাধব বাবু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েন। মৌলবী সাহেব ফরিদপুর হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া ঢাকার জজ-আদালতের উকীলদিগের নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর যোগ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"তিনি সওয়াল করিবার সময়ে যে উর্দ্দু বলিয়াছেন, তাহা এই আদালতের মধ্যে যে উকীল খুব ভাল উর্দ্দু বলিতে পারেন তাঁহারই মত তিনি অনর্গল ভাল উর্দ্দু বলিয়াছিলেন।"

অতঃপর চন্দ্রমাধব বাবু ঢাকা হইতে তাঁহার জন্মভূমি ষোলঘড় গ্রামে গমন করেন। সেখানে তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি জানিতে পারেন যে, এবারক্রম্‌বি সাহেব ফরিদপুর হইতে ঢাকায় ফিরিলে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এবারক্রম্‌বি সাহেব কথাপ্রসঙ্গে এই মামলার কথা চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার নিকট উত্থাপন করিয়া বলেন—"হাইকোর্টের এক ছোকরা উকীল আমার এজলাসে আসামীর তরফে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে আমাকে খুবই ভুগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ছোকরা উকীল খুব যোগ্য এবং বড় চালাক।" এবারক্রম্‌বি সাহেব অবশ্য জানিতেন না যে, যাঁহার নিকট তিনি উক্ত উকীলের কথা বলিতেছেন তিনি উক্ত উকীলের পিতা। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতাও ইহা উক্ত জজ সাহেবের নিকট ভাঙ্গেন নাই।

এই মামলায় জয়লাভের ফলে ঢাকা জেলা হইতে চন্দ্রমাধব বাবু বিস্তর মামলা পাইতে থাকেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ফরিদপুরের ব্যাপার কয়েকজন উকীলকে এবং বিচারপতি বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে বলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা খুব হাসির রোল তুলিয়াছিলেন। শম্ভুনাথ বাবু ও দুই একজন উকীল বলেন,—"চন্দ্রমাধব বাবু আপনি অত্যন্ত দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন, যদি দায়রা-জজ আদালত-অবমাননার অপরাধে আপনাকে শাস্তি দিতেন, তবে আপনি কি করিতে পারিতেন?" চন্দ্রমাধব বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"হাইকোর্টে আপনাদের মত আমার যে সব বন্ধু রহিয়াছেন তাঁহারা হাইকোর্টে আপীল করিয়া উক্ত জজের অন্যায় আদেশ নাকচ করাইতেন।" হাইকোর্টে চন্দ্রমাধব বাবু নির্ভীক, তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, দৃঢ়চেতা ও অকপট উকীল ছিলেন, তাঁহার সাধুতার বিষয় উকীল ও জজদের নিকট অবিদিত ছিল না। তাই যদি কখনও তিনি অত্যন্ত কঠোর ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, জজেরা তাহাতে আপত্তি করিতেন না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই—মামলায় এরূপ মন্তব্য-প্রকাশের ভিত্তি পাইয়াই তিনি এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সময়ে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত পুরাতন সিবিলিয়ান হাইকোর্টের উকীল-শ্রেণীভুক্ত (Vakil) হইবার জন্য আবেদন করেন এবং তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হয় ও তাঁহারা উকীলশ্রেণীভুক্ত হয়েন। তাঁহাদিগের নাম—মিষ্টার জর্জ্জ প্লাউডেন, মিষ্টার গোল্ডস্‌বেরী এবং মিষ্টার ষ্টেনফোর্থ। প্লাউডেন সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ছিলেন; ইঁহারই দ্বারা চন্দ্রমাধব বাবুর ডেপুটী কলেক্টরী চাকরী নষ্ট হইয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গোল্ডস্‌বেরী সাহেব পূর্ব্বে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার ছিলেন। প্লাউডেন সাহেব ও

গোল্ডস্‌বেরী সাহেব প্রথম প্রথম বড় বড় জমিদারের নিকট হইতে কয়েকটী মামলা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ওকালতীতে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তাঁহারা প্রথমেই সরিয়া পড়েন। ষ্টেনফোর্থ সাহেব ইঁহাদের পর আরও কিছুদিন হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তার পর তিনিও চলিয়া যান। প্লাউডেন সাহেব ও চন্দ্রমাধব বাবু একই আদালতের উকীলও হইলেও উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা ছিল না। তবে ঢাকার ওয়াইজ সাহেবের মামলায় প্লাউডেন সাহেব ও চন্দ্রমাধব বাবু উভয়েই নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সেই সময়ে দুইজনকে বাধ্য হইয়া কথা কহিতে হইয়াছিল। ষ্টেনফোর্থ সাহেব রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'রিভিউ' মামলায় বিচারপতি রাইকেস ও ষ্টীয়ার সাহেবের এজলাসে ষ্টেনফোর্থ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টেনফোর্থ সাহেবের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে ষ্টেনফোর্থ সাহেবের উচ্চ ধারণা ছিল।

রাসবিহারী ঘোষ ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়

সম্ভবতঃ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাবু রাসবিহারী ঘোষ, বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ হাইকোর্টের উকীলশ্রেণীভুক্ত হয়েন। গুরুদাস বাবু কিছুদিন মুর্শিদাবাদের উকীল ছিলেন, সেই জন্য রাসবিহারী বাবুর কিছু পরে তিনি হাইকোর্টে আসেন। বাবু ত্রৈলোক্য-নাথ মিত্র (পরে ডক্টর) পূর্ব্বে হুগলীতে ওকালতী করিতেন, ইনিও রাসবিহারী বাবুর পরে হাইকোর্টে ভর্ত্তি হয়েন। ইঁহারা সকলেই যোগ্য ব্যক্তি, এবং অল্পদিনের মধ্যেই হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ (হিন্দু হইতে মুসলমান ধর্ম্মে

দীক্ষিত) মুন্সী আমীর আলীর অনুগ্রহে গয়া হইতে আসিয়াছিলেন। ইউসুফ সাহেব দক্ষ, চতুর ও পরিশ্রমী ছিলেন; হাইকোর্টে শীঘ্রই তাঁহার পশার জমিয়া উঠে। বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কাহাকে করা হইবে—ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন্ উকীল কত মামলা পান তাহার একটী তালিকা তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড কাউচের আদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। এই তালিকায় ইউসুফ সাহেবের নাম প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল।

বাবু রাসবিহারী ঘোষ উকীল হইবার অল্পদিন পরেই ডক্টর (Doctor) উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উদ্ধত ছিল এবং অল্পেই রাগিয়া উঠিতেন বলিয়া অধিকাংশ উকীল ও জজ তাঁহাকে পছন্দ করিতেন না। তবে আইনে প্রগাঢ় অধিকার ছিল বলিয়া তাঁহার সম্মান অত্যন্ত অধিক ছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী বাবুর তুল্য প্রতিভাসম্পন্ন না হইলেও তিনি আইনে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার স্বভাব ছিল নম্র, ব্যবহারও ছিল শিষ্ট-শান্ত; বিশেষতঃ যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিতেন, তাঁহারই সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন বলিয়া তিনি শীঘ্রই লোকের প্রীতিশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত গুরুদাস বাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং ক্রমে উভয়ে উভয়ের অনুরাগী হইয়া উঠেন। ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র রাসবিহারী বাবু ও গুরুদাস বাবুর সমতুল্য ছিলেন না, তাঁহার স্থান উঁহাদের অপেক্ষা নিম্নে ছিল।

এই সময়ে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক হাইকোর্টের উকীলশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম—মিষ্টার রেঞ্চফোর্ট; ইনি পূর্ব্বে খুলনার লবণ বিভাগের অধ্যক্ষ (Salt-Superintendent) ছিলেন; বাবু রাজেন্দ্র মিত্র এবং বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনাথ বাবু

বিক্রমপুরের অধিবাসী। ইঁহাদের সকলেরই সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

প্রথম সন্তানের মৃত্যু

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে চন্দ্রমাধব বাবুর প্রথম পুত্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৬ বৎসর। জ্ঞানেন্দ্র কাঁসারীপাড়ার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিল এবং প্রথম হইতেই বিদ্যালয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকগুলি বাঙ্গালা বই সে পড়িয়াছিল; এমন কি. সে বাঙ্গালাতে জ্যামিতিও অধ্যয়ন করিতেছিল। একবার একজন প্রসিদ্ধ সিভিল সার্জ্জন চন্দ্রমাধব বাবুর বাড়ীতে একটী রোগী দেখিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি জ্ঞানেন্দ্রকে পাঠে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞসা করেন বালকটী কি পড়িতেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকে বলা হয় যে বালকটি জ্যামিতি (Geometry) পড়িতেছে। তখন সিভিল সার্জ্জন বলেন, আপনারা ছেলেটীকে বধ করিতেছেন। শেষে তাঁহার কথাই ফলিল; জ্ঞানেন্দ্র আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা পড়িল। ছেলেটী দেখিতে অতি সুশ্রী ছিল। অতি অল্প বয়সে তাহার গুণপণা দেখিয়া লোকে বলিত—এ ছেলে বাঁচিলে হয়! জ্ঞানেন্দ্রের মৃত্যুতে চন্দ্রমাধব বাবুর পরিবারে শোকের যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না।। পরিবারের প্রত্যেকেই জ্ঞানেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। বিশেষতঃ চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। জ্ঞানেন্দ্র পিতামহের কোলে বসিয়া আছে—এরূপ অবস্থার একখানি ফটোগ্রাফ আছে। জ্ঞানেন্দ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রমাধব বাবুদের পরিবারে আরও তিনজনের মৃত্যু ঘটে:— (১) চন্দ্রমাধব বাবুর জ্যেষ্ঠতাত হর প্রসাদ ঘোষ; (২) চন্দ্রমাধববাবুর জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র বাবু নীলমাধব ঘোষের একমাত্র পুত্র এবং

(৩) নীলমাধবের মাতা। পর পর এই চারি জনের মৃত্যুতে চন্দ্রমাধব বাবুর মন এরূপ ভাঙ্গিয়া যায় যে, তিনি ওকালতীতে মন দিতে অসমর্থ হয়েন। এমন কি, সন্ধ্যার সময়ে তিনি আফিস-ঘরে পর্য্যন্ত বসিতেন না। এইজন্য তাঁহার ওকালতীতে অত্যন্ত ক্ষতি হয়; ব্যবসা মন্দা পড়িয়া যায়। তাঁহার পশার মন্দ হইবার আর একটী কারণ—তাঁহার দুইজন মুহুরী আনন্দনাথ চৌধুরী ও অম্বিকাচরণ বসু তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গস্থিত কতিপয় মক্কেলের সহিত ষড়যন্ত্র করে; ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য—যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন মোক্তার ছাড়িয়া দিয়া উহাদিগকেই তাঁহাদের মোক্তার করেন। দুই একটী স্থলে উহাদের এই উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকজন মোক্তার এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর হাতে মামলা দিতে ভীত হয়েন। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবুর পূর্ব্ববঙ্গের মামলা খুব কমিয়া যায়; এক সময়ে তাঁহার হাতে পূর্ব্ববঙ্গের মামলা একেবারেই কমিয়া গিয়াছিল; এমন কি, দুই চারিটাও আসিত কি না সন্দেহ। অতঃপর তাঁহার চক্ষু খুলে। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ঔদাসীন্যে ও তাঁহার মুহুরীদের আচরণে তাঁহার কি বিপুল ক্ষতি হইয়াছে।

এই সময়ে উকীল বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র পূর্ব্ববঙ্গের মোক্তারদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহারা চন্দ্রমাধব বাবুর মুহুরীদের আচরণে শঙ্কিত হইয়া রমেশচন্দ্রকে মামলা দিতে লাগিলেন। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিস্তর মামলা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়ে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তিনি পরে তাঁহার এই দুই অঞ্চলের বিপুল পশার ফিরিয়া পান নাই। অবশ্য অনেকটা পশার আবার ফিরিয়াছিল বটে, কিন্তু সমস্ত পশার আর ফিরিয়া আসে নাই। বিহার অঞ্চলের পশারও তাঁহার কতকটা নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আবার

তাহা ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিহারের মামলাই খুব বেশী করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন; তাহার পর হইতে চন্দ্রমাধব বাবুর হাতেই বিহারের মামলা খুব বেশী আসিতে থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাবু রমেশ-চন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের জজ হয়েন। সেই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু বিহারের মামলা যত পাইতেন এত আর কোনও উকীল পাইতেন না। বিহারের যত ভাল ভাল মামলা সে সমস্তই চন্দ্রমাধব বাবু ও বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী ভাগাভাগি করিয়া পাইতেন। তবে চন্দ্রমাধব বাবুর সকল অঞ্চলের মামলা ধরিলে তাহাদের সংখ্যা মহেশ বাবুর অপেক্ষা অনেক বেশী হইত। মহেশবাবুর পশার বেশীর ভাগ বিহারেই আবদ্ধ ছিল।

জামাতার মৃত্যু

যে বৎসর চন্দ্রমাধব বাবুর পরিবারে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে এবং যাহার ফলে তাঁহার পশার কমিয়া যায়, সেই বৎসর তাঁহার প্রথমা কন্যা ষোড়শীবালা জন্ম গ্রহণ করে। চন্দ্রমাধব বাবু তখন কাঁসারিপাড়ায় রামকুমার যাত্রাওয়ালার বাড়ীতে থাকিতেন। ইহার পরে তাঁহার আরও দুইটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়—কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রচন্দ্র এবং দ্বিতীয় কন্যা নলিনীবালা। সুরেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং নলিনীবালা জন্ম গ্রহণ করে—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। ইহারা যে বাড়ীতে ভূমিষ্ঠ হয় সেই বাড়ী ভবানীপুর ৮নং চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এই বাড়ী চন্দ্রমাধব বাবু ক্রয় করিয়াছিলেন ও উহার সংস্কার-সাধনও করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথমা কন্যার সহিত টাকীর জমিদার স্বর্গীয় তারাশঙ্কর রায়চৌধুরীর পুত্র বাবু অক্ষয়চন্দ্র রায়চৌধুরীর বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়চন্দ্র ওলাউঠা-রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তিনি ভবানীপুরে থাকিয়া লেখাপড়া

শিখিতেছিলেন। এই ঘটনায় চন্দ্রমাধব বাবুর পরিবারে আবার শোকের ঝড় উঠে। অক্ষয়চন্দ্রের আকৃতি ছিল যেমন সুন্দর প্রকৃতিও ছিল তেমনই সৎ। স্বভাব মধুর ছিল বলিয়া তিনি সকলেরই প্রীতি-ভাজন ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুকালে তাঁহার কন্যা ষোড়শীবালার বয়স হইয়াছিল মাত্র ১৩ বৎসর। অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুকালে ষোড়শীবালা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং পরে তাঁহার এক কন্যা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিন বৎসরের কন্যাটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পশার হ্রাস হওয়ায় চন্দ্রমাধব বাবু উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন যে, ওকালতী কঠোর শ্রমসাধ্য কার্য্য। ওকালতীতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে এবং সেই সাফল্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে কেবল পাণ্ডিত্য ও কৌশল থাকিলেই চলিবে না, একটানা কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। পশার হইয়াছে আর ভয় কি—এই মনে করিয়া একটু শৈথিল্য দেখাইলেই তাহার পতন হইবে। কারণ, যাহারা মামলা জোগাইয়া থাকে তাহারা সর্ব্বদাই উকীলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। তাহারা কেবল দেখে—উকীল তাহাদের মামলার জন্য ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতেছে কি না। উকীলকে কেবল যে আদালতেই ভাল কাজ করিতে হইবে তাহা নহে, বাড়ীতেও মামলার জন্য খাটিয়া-খুটিয়া উকীলকে প্রস্তুত হইতে দেখিলে মক্কেলের বিশ্বাস জন্মে যে, তাহার উকীল তাহার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতেছেন। মক্কেলের এই বিশ্বাসই উকীলের সাফল্যের মুল। একবার এই বিশ্বাস নষ্ট হইলে উকীলের পশারও নষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রমাধব বাবু এমন সকল মামলায় বেশীর ভাগ নিযুক্ত হইতেন, যে সকল মামলার বিচার্য্য বিষয় হইত ম্যাপ অর্থাৎ যাহাদের বিচারের সময়ে ম্যাপ-সংক্রান্ত আলোচনা উত্থাপিত হইত। এই শ্রেণীর মামলায় বাবু শ্রীনাথ দাসের কৃতিত্ব ও পারদর্শিতা সমধিক ছিল। লোকে

তাঁহাকে এই শ্রেণীর মামলা পরিচালনার পক্ষে ভাল উকীল মনে করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুকে লোকে এই বিষয়ে শ্রীনাথ বাবুর ঠিক পরবর্ত্তীই মনে করিতেন। এই শ্রেণীর অনেক মামলায় লোকে চন্দ্রমাধব বাবুকে শ্রীনাথ বাবুর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিত। চন্দ্রমাধব বাবু এইসকল মামলায় শ্রীনাথ বাবুর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং অনেক মামলায় তাঁহাকে চন্দ্রমাধব বাবু হারাইয়াও দিতেন—বিশেষতঃ বিহার অঞ্চল হইতে আগত এই শ্রেণীর মামলায়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্তর বার্ণেস পিকক ছুটী লয়েন; তাঁহার স্থলে বিচারপতি মিষ্টার নরম্যান অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। মিষ্টার নরম্যান কিন্তু সিনিয়র পিউনি জজ (Senior Puisne Judge) ছিলেন না, তথাপি তাঁহাকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহার কারণ সম্ভবতঃ ইহাই ছিল যে, আইন-অনুসারে ব্যারিষ্টার জজ ভিন্ন আর কাহাকেও অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করা যাইত না।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার মার্কবি (পরে স্তর উইলিয়ম মার্কবি) হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, শিষ্টাচারসম্পন্ন, সদয়হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন; আইনেও তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল এবং তিনি বিবেক-বুদ্ধি-অনুসারে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। অন্যান্য বিচারপতি অপেক্ষা মামলা বুঝিয়া লইতে তাঁহার দেরী হইত এবং উহার রায় দিতেও তিনি অধিক বিলম্ব করিতেন। বিচারপতি জ্যাকসন সাহেবের সহযোগী হইয়া তিনি বিচারাসনে বসিলে জ্যাকসন সাহেবকে বিব্রত হইতে হইত। তিনি তাড়াতাড়ি বিচারকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন না। মার্কবি সাহেব বালক অপরাধীদিগের চরিত্র-সংশোধনের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেন। এক সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার সহিত এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোনও

ফল হয় নাই। মিষ্টার মার্কবি চন্দ্রমাধব বাবুর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে উঁহার উচ্চধারণা ছিল।

১৮৬৬ অথবা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বাবুর পিতৃদেব ঢাকার জ রপ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; তিনি প্রায়ই রোগে ভুগিতেন। এইজন্য চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার পিতাকে জোর করিয়া বলেন—"আপনি পেন্সন লউন আর চাকরী করিবার প্রয়োজন নাই। আমি আপনার একমাত্র পুত্র, আমি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেছি; আমার উপার্জ্জনে আমাদের পরিবার প্রতিপালন স্বচ্ছলে হইতেছে। এমন অবস্থায় আর আপনার চাকুরী করিবার প্রয়োজন নাই। এখন পেন্সন লইলে আপনি তিনশত টাকা পেন্সন পাইবেন ইহা ত কম নহে সুতরাং আপনি অবসর গ্রহণ করুন।" পুত্রের কথায় পিতা পেন্সনের দরখাস্ত করিলেন কিন্তু রেভেনিউ সার্ভে বিভাগের অধ্যক্ষ চন্দ্রমাধব বাবুর পিতাকে অবসর দিতে অসম্মত ছিলেন, ইহার কারণ আর কিছুই নহে—দুর্গাপ্রসাদ বাবু সুযোগ্য কর্ম্মচারী ছিলেন এবং জরীপের ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা ছিল। সেইজন্য উক্ত অধ্যক্ষ দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে বলিলেন, "আমি রেভেনিউ বোর্ডকে দিয়া সুপারিশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী কলেক্টর করিয়া দিব আপনি, এখন পেন্সনের দরখাস্ত করিবেন, না।" দুর্গাপ্রসাদ বাবু এই বিষয় তাঁহার পুত্রকে লিখিয়া জানাইলেন। চন্দ্রমাধব বাবু তখন ঢাকায় গিয়া তাঁহার পিতার উপরিওয়ালা জরীপ বিভাগের অধ্যক্ষের সহিত দেখা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। পূজার ছুটিতে তিনি ঢাকায় যাইলেন এবং তাঁহার পিতাকে সঙ্গে লইয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন। তাঁহার কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় (Superintendent of Surveys) চুপ করিয়া রহিলেন; তিনি পরে দুর্গাপ্রসাদ বাবুর

পেন্সনের দরখাস্ত রেভেনিউ বোর্ডের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঢাকার সমস্ত উচ্চপদস্থ দেশীয় সরকারী কর্ম্মচারী চন্দ্রমাধব বাবুর পিতাকে সম্মান করিতেন এবং সকলেই তাঁহার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই চন্দ্রমাধব বাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পিতাকে পেন্সন লইতে জিদ না করেন। চন্দ্রমাধব বাবু কিন্তু তাঁহাদের এ অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতারও এত শীঘ্র চাকুরী হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা ছিল না। এদিকে রেভেনিউ বোর্ড তাঁহার পিতার পেন্সনের দরখাস্ত পাইয়া লিখিয়া জানাইলেন যে, দুর্গাপ্রসাদ বাবু যদি আরও কিছুদিন চাকুরী করেন তাহা হইলে বোর্ড খুব খুসী হইবেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবু বোর্ডের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত ছিলেন না, কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন, কিছুতেই আর তাঁহার পিতার চাকুরী করা হইবে না। তিনি স্পষ্টই তাঁহার পিতাকে বলিলেন— "এত অধিক বয়সে ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য হইয়া কঠিন পরিশ্রম করিলে আত্মঘাতী হইতে হইবে। পেন্সন আপনাকে লইতেই হইবে।" পরিশেষে পুত্রের অনুরোধই প্রবল হইল; দুর্গাপ্রসাদ বাবু বোর্ডকে জানাইলেন যে, তিনি পেন্সন লইবেন। অতঃপর গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পেন্সনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং তৎসহ তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিও দিলেন। পেন্সন লইয়া চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা ঢাকা হইতে চন্দ্রমাধব বাবুর মাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু কিছুদিন পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে যে বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন এবং যাহা মেরামৎ করিয়া একেবারে নূতন করিয়া লইয়াছিলেন চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা পরিজনবর্গের সহিত সেই বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

তখনকার কালে রায় বাহাদুর উপাধি এখনকার মত সুলভ হয় নাই।

তখনকার কালে কেবল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবজজদিগকেই এই উপাধি দেওয়া হইত এবং তাঁহারা সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার কালেই অর্থাৎ পেন্সন লইবার পূর্ব্বেই এই উপাধি পাইতেন। আমাদের বিশ্বাস চন্দ্রমাধব বাবুর পিতাকেই অবসর গ্রহণের পর গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার সি-পি হবহাউস (পরে স্তর চার্লস হবহাউস বার্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। ইনি পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কলেক্টর ছিলেন ও পরে জেলা-জজ হইয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা যখন বর্দ্ধমানে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন তখন এই হবহাউস সাহেব তাঁহার উপরওয়ালা ছিলেন। হাইকোর্টে কিন্তু ইনি জজ-হিসাবে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি যত দিন হাইকোর্টের জজ ছিলেন ততদিন চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত তিনি ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন; সেই সময়ে তাঁহার পিতৃব্যের মৃত্যু হইলে তিনি ব্যারণ (Baron) হয়েন।

১৮৬৬ বা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সকল সম্প্রদায়ের লোকই শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ বিচারক-হিসাবে তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিলেন। উকীল বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র তাঁহার স্থলে বিচারক নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার যোগ্যতার বিষয় সকলের বিদিত ছিল বলিয়া তাঁহার নিয়োগে সকল শ্রেণীর লোকই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

চন্দ্রমাধব বাবুর পীড়া

সম্ভবত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে চন্দ্রমাধব বাবুর পৃষ্ঠব্রণ হয়

ক্রমেই উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং যাতনাদায়ক হইয়া উঠে। ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী তখন চন্দ্রমাধববাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ও ডাক্তার কাশীচন্দ্র দত্ত পৃষ্ঠব্রণটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু অস্ত্রোপচার করা উচিত কি না সে বিষয়ে তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না; কাজেই কলিকাতার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক ফেরার সাহেবকে আনা হইল। ফেরার সাহেব ব্রণটী দেখিয়া বলিলেন—"অস্ত্র করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই; তবে হাইকোর্ট পূজার ছুটীতে বন্ধ হইলে পরও অস্ত্রোপচার করা যাইতে পারে।" ফেরার সাহেব চলিয়া যাইবার পর তিনি ডাক্তার সূর্য্যকুমার ও ডাক্তার কাশীচন্দ্রকে বলিলেন—"অস্ত্রই যদি করিতে হয় তাহা হইলে আর বিলম্ব করিবেন না, অবিলম্বে অস্ত্র করুন। সূর্য্যবাবু আপনি শীঘ্র অস্ত্র করিবার জন্য ব্যবস্থা করুন।" ইহাতে সূর্য্যবাবু বলেন—"আমি যখন আপনাদের পারিবারিক চিকিৎসক এবং অস্ত্র করিতে সমর্থ তখন আমি অস্ত্রোপচার করিব। তবে আপনি যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ফেরার সাহেবকে উপস্থিত থাকিতে বলিতে পারেন।" ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু উত্তর করেন—"ফেরার সাহেবকে যদি ছুরি ধরিতে না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আনিবার দরকার নাই। আপনি আজই অস্ত্রোপচার করিবার ব্যবস্থা করুন।" তৎক্ষণাৎ চন্দ্রমাধব বাবুর পৃষ্ঠব্রণে অস্ত্রোপচার করিবার ব্যবস্থা করা হইল। তিনজন ডাক্তার এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন; স্থির হইল, সূর্য্যকুমার বাবু অস্ত্র করিবেন, কাশীচন্দ্র বাবু তাঁহার সহযোগিতা করিবেন এবং ডাক্তার বিহারীলাল ঘোষ রোগীকে ক্লোরোফরম (Chloroform) করিবেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পূর্ব্ব হইতে ধারণা ছিল যে, ক্লোরোফরম করিলে রোগী আর বাঁচে না—অজ্ঞান অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইজন্য ক্লোরো-ফরম দ্বারা অজ্ঞান হইতে চন্দ্রমাধব বাবু অনিচ্ছুক ছিলেন, তাই যখন

২।৩ মিনিট ধরিয়া ক্লোরোফরম প্রয়োগ করা হয় এবং যখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সংজ্ঞা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন এইরূপ ভাণ করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সংজ্ঞা হারান নাই। ডাক্তার মনে করেন ক্লোরোফরম-প্রয়োগ সফল হইয়াছে, চন্দ্রমাধব বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন আর ক্লোরোফরম দিবার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রমাধব বাবুকে অজ্ঞান মনে করিয়া সূর্য্যকুমার বাবু অস্ত্রোপচার আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায় অস্ত্র-প্রয়োগের তীব্র যন্ত্রণা দন্তে দন্ত দিয়া অসামান্য সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিতে লাগিলেন। অস্ত্র-প্রয়োগ ঠিকমত হয় নাই। প্রথমতঃ সূর্য্যকুমার বাবু উৎকৃষ্ট অস্ত্রোপচারবিৎ ছিলেন না; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ছুরি ভাল ছিল না - অস্ত্র করিতে করিতে তাঁহাকে ছুরি বদল করিতে হইয়াছিল, কারণ তাঁহার নিজের ছুরিতে একবার কি দুইবার ব্রণ কাটে নাই। একবার কাটা এত খারাপ হইয়াছিল যে, চন্দ্রমাধব বাবুকে গোঙাইতে হইয়াছিল। ডাক্তার বিহারী বাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহার নাসিকায় ক্লোরোফরম প্রয়োগ করেন কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করেন। যাহা হউক অস্ত্রোপচার শেষ হইয়া যাইল; কর্ত্তিত স্থান সেলাই করিয়া দেওয়া হইল; ডাক্তারেরা সূর্য্যকুমার বাবুকে অস্ত্রোপচারে সাফল্যের জন্য প্রশংসা করিলেন। অন্য দুইজন ডাক্তার জ্ঞান আনিবার জন্য তাঁহার মুখে জল ছিটাইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্রমাধব বলিলেন, "আর মুখে জল দিবার দরকার নাই, যাহা হইয়াছে সবই আমি জানি, কারণ আমি জ্ঞান হারাই নাই।" ডাক্তারেরা ইহাতে বিস্মিত হয়েন এবং মনে করেন, চন্দ্রমাধব বাবু ক্লোরোফরমের ঘোরে এইরূপ কথা বলিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহার ঘোর কাটাইবার নিমিত্ত আবার তাঁহার মুখে জল ছিটাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন চন্দ্রমাধব

বাবু চক্ষু মেলিয়া বলিলেন—"আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, সজ্ঞানে আমি অস্ত্রোপচার করাইয়াছি।" এই বলিয়া একে একে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তিনি সকলই বর্ণনা করিলেন। তখন ডাক্তারেরা তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসের পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন এবং সেজন্য তাঁহার প্রভূত সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। যৌবনে চন্দ্রমাধব বাবু সত্যই অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ছিলেন এবং কোন প্রকার শারীরিক কষ্ট বা দুঃখকে গ্রাহ্য করিতেন না, শারীরিক যন্ত্রণা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার সেরূপ সাহস ও সহিষ্ণুতা ছিল না। পরিণত বয়সে সজ্ঞানে অস্ত্রোপচার করিতে তাঁহার ভয় হইত। যাহা হউক, পৃষ্ঠব্রণে অস্ত্রোপচারের ফলে তাহাকে দুইমাস শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। দুইমাসের পর ক্ষতস্থান শুষ্ক হইলে তিনি তাহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র বাবু নীলকমল ঘোষের সহিত বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ এলাহাবাদ গমন করেন। সেই সময় তাহার পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন—তিনি তখন অত্যন্ত বালক। পূজার দীর্ঘ অবকাশের পর তিনি এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ডব্লিউ এন্স্লি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। তিনি সিবিলিয়ান। পূর্ব্বে তিনি জেলা-জজ ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী, অভিজ্ঞ ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন বিচারক ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর সম্বন্ধে তিনি উচ্চধারণা পোষণ করিতেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি স্যর বার্ণেস পিকক পুনরায় ছুটী লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেবারও বিচারপতি নরম্যান সাহেব সিনিয়র পিউনি জজ না হইয়াও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অস্থায়ীভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিবার সময়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

স্যর বার্ণেস পিকক ছুটীতে বিলাতে থাকিবার সময়েই—তথা হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। স্যর রিচার্ড কাউচ তাঁহার স্থলে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসেন। স্যর বার্ণেসের অবসর গ্রহণের পরে হাইকোর্টের উকীলগণ সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, তাঁহারা এই প্রসিদ্ধ বিচারপতির একটী তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া উহা হাইকোর্টে রাখিবেন। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, তাঁহারা তাঁহাদের সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা তাঁহাকে যে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা ইংলণ্ডে স্যর বার্ণেসের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তৈলচিত্র প্রস্তুত হয় নাই, ইহার কারণ অধিকাংশ উকীল চাঁদা দিতে চাহেন নাই। ইহা প্রস্তুত করিতে খরচাও অনেক পড়িত। অথচ স্যর বার্ণেসকে সকলেই একজন বড়দরের জজ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে চন্দ্রমাধব বাবুর অভিমত ইহাই ছিল যে, তাঁহার সম-সময়ে তাঁহার তুল্য যোগ্য, ধর্ম্মভীরু, স্থির-ধীর, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ বিচারক দ্বিতীয় আর কেহ হাইকোর্টে ছিলেন না।

স্যর রিচার্ড কাউচ কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তদানীন্তন সিনিয়র পিউনি জজ মিষ্টার কেম্প অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির পদে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বিচারপতি নরম্যান সাহেবের হত্যার পরই কেম্প সাহেবকে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

স্যর রিচার্ড কাউচ প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার যোগ্যতার ও বিবেকবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু স্যর বার্ণেসের সহিত তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারিত না। স্যর রিচার্ড মোটেই শিষ্টাচারপরায়ণ ছিলেন না, উকীল-ব্যারিষ্টারদিগের

প্রতি তিনি বড় কর্কশ ব্যবহার করিতেন। মাঝে মাঝে তিনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেন। সেইজন্য তিনি লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তাই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন, সেই সময়ে উকীলেরা তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করেন নাই; সম্ভবতঃ ব্যারিষ্টাররাও তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে ভোজ দেন নাই।

একটী অত্যন্ত জটিল আপীল-মামলা অনেক দিন ধরিয়া স্যর রিচার্ড কাউচের এজলাসে হইয়াছিল। এই মামলায় আপীল-কারীদের তরফে চন্দ্রমাধব বাবু নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর যুক্তিতর্কপূর্ণ সওয়াল শুনিয়া স্যর রিচার্ডের মনে তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চধারণা জন্মিয়াছিল এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের নিকট তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থানে কাহাকে নিযুক্ত করা হইবে—ইহা লইয়া আলোচনা হইলে প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড কাউচের নিকট যাঁহাদের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবুর নামও ছিল। স্যর রিচার্ড কাহার নাম সুপারিশ করিবেন—ইহা লইয়া কিছুদিন ভাবিয়াও ছিলেন। পরিশেষে তিনি আদেশ করেন যে, গত ৪।৫ বৎসর কোন্ কোন্ বড় উকীল কত মামলা করিয়াছেন তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হউক। এই তালিকা প্রস্তুত হইলে দেখা যায়,—উকীল মহম্মদ ইউসুফ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মামলায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি জুনিয়র। তাঁহার পরবর্ত্তী উকীলের নাম—বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র; রমেশ বাবুর পরেই চন্দ্রমাধব বাবু। সুতরাং রমেশবাবুর নামই প্রধান বিচারপতি মহোদয় সুপারিশ করিলেন এবং বিচারপতি দ্বারকানাথের আসনে তিনিই উপবিষ্ট হইলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উকীল বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। ঐ বৎসরই ব্যারিষ্টার মিষ্টার চার্লস পলকেও অস্থায়ী-ভাবে বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সুনিপুণ ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারক-হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি সময়ে সময়ে অধীরতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন এবং মমতাভিমানী ছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল ঐ বৎসরেই শেষ হইয়া যায়।

ঐ বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে উকীল বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা হয়। অনুকূল বাবুর নিয়োগে হাইকোর্টের উকীলদিগের হাইকোর্টের জজ হইবার যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এতদিন মাত্র একজন দেশীয় ব্যক্তিকে হাইকোর্টের জজ করা হইত। অনুকূল বাবুর নিয়োগে সে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। অনুকূল বাবু বিদ্যাবত্তা, যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিচারপতি-পদে নিয়োজিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঠিক কাজই করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র এক বৎসর গত হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার চার্লস পণ্টিফিক্স হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। হাইকোর্টে সমদর্শী বিচারক হিসাবে তিনি বিচারকার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাহা নহে, তিনি কর্ম্মতৎপর বুদ্ধিমান এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন। কোনও বিশেষ উকীল বা ব্যারিষ্টারের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিতা ছিল না। চন্দ্রমাধব বাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চধারণা ছিল এবং তিনি তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই সংবাদ শুনিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, বড়ই দুঃখের বিষয়, এত দিন চন্দ্রমাধব বাবুকে জজ করা হয় নাই। তিনি (পণ্টিফিক্স সাহেব) যখন হাইকোর্টের জজ ছিলেন সেই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবুকে জজ করিলে তাঁহার সহিত একত্র বসিবার সৌভাগ্য তাঁহার (পণ্টিফিক্স) হইত।

চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার মৃত্যু

১৮৭২ বা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু আকস্মিকভাবেই হইয়াছিল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তাঁহার বুকে বেদনা হইয়াছিল। তিনি ইহা তৎপরদিন প্রাতে তাহার পুত্র চন্দ্রমাধব বাবুকে জানাইয়া ছিলেন। কিন্তু সেইদিন সমস্ত সকাল বেলাটা তিনি বসিয়া বসিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, তখনই ডাক্তার আনাইয়া দেখানো হয়। ডাক্তার বলেন,—"কঠিন অসুখের কোনও লক্ষণ ত দেখিতে ছি না; তবে তিনি যেন সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করেন।" তদনুসারে তিনি দৈনিক পূজা আহ্নিক ইত্যাদি সত্বর সারিয়া লয়েন এবং আহারাদি করিয়া বাড়ীর অন্দর মহলে দ্বিতলে তাহার ঘরে খাটের উপর বসিয়া তামাক খাইতে থাকেন। সেই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু ডেঙ্গুজ্বর ভোগ করিয়া সবে মাত্র সারিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তখন নীচের তলায় আহার করিতেছিলেন। সেই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবুর পুত্র যোগেন্দ্র উপরতলা হইতে দৌড়িতে দৌড়িতে নামিয়া আসিয়া তাহার পিতাকে বলে—"বাবা ঠাকুরদাদা কেমন করিতেছেন, শীঘ্র উপরে আসুন।" চন্দ্রমাধব বাবু তখনই খাবার ফেলিয়া উপরে ছুটিয়া যাইলেন

এবং দেখিলেন, তাঁহার পিতা বুকে বালিশ দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাহার গায়ে হাত দিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাক দিতেই তিনি ক্ষীণস্বরে মাত্র "ওঃ" বলিয়া উঠেন এবং পরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। তিনি যেন তাঁহার একমাত্র পুত্রের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্যই তদবস্থায় বসিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যু হইয়াছে। তাই তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিলেন। তাঁহার ডাক শুনিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর মাতা এবং পরিবারের অন্যান্য লোক ছুটিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়েন। তখনই ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার আসিয়া বলেন—"ইতিপূর্ব্বেই ইহার মৃত্যু হইয়াছে; হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই মৃত্যুর কারণ" এমন মৃত্যু দুঃখের মৃত্যু নহে—সুখের মৃত্যু। কারণ, তিনি নিজেও ভুগেন নাই, অপরকেও ভোগান নাই। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা আহার করিবার সময় পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"কল্য রাত্রিতে আমার বুকে যেরূপ বেদনা হইয়াছিল, এখন আবার সেইরূপ তীব্র বেদনা হইতেছে। তুমি আমাকে আজই কাশীতে লইয়া চল।" কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু মনে করিলেন—এ বেদনা ফিক্ বেদনা—শীঘ্রই আরাম হইবে। তার পর যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা খাটের উপর বসিলেন তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া খাইবার জন্য নীচে নামিয়া আসেন। নামিয়া আসিবার সময়ে তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়া আসেন—"আমি আজ রাত্রিতেই আপনাকে কাশীধামে লইয়া যাইব।" কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার এই শেষ বাসনা পূর্ণ হয় নাই। কারণ তাঁহার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যে সকল জেলায় তিনি সরকারী কার্য্য উপলক্ষে অবস্থিতি করিতেন, সেখানকার সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ

তাঁহাকে সম্মান করিতেন ; সকলেই জানিতেন—দুর্গাপ্রসাদ বাবু সদাশ উচ্চহৃদয় ব্যক্তি। তাই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে দুইজন সিভিলিয়ান জজ নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের নাম মিষ্টার ই-জি বার্চ্চ ও মিষ্টার জি-জি মরিস। চন্দ্রমাধব বাবু যখন বর্দ্ধমানের উকীল-সরকার ছিলেন, সেই সময়ে বার্চ্চ সাহেব তথাকার কলেক্টর ছিলেন। তিনি শিষ্টাচার ও সদুদ্দেশ্য-পরায়ণ, করুণহৃদয়, ধর্ম্মভীরু এবং সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু জজ-হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাই তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন উকীলেরা তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান করেন নাই। চন্দ্রমাধব বাবুর অনুরোধে কয়েকজন প্রসিদ্ধ উকীল তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অবসর-গ্রহণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মরিস সাহেব বিচারকার্য্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার নাম হয় নাই, কয়েক বৎসর পরে বিচারক-হিসাবে তাঁহার বেশ নাম হইয়াছিল। তিনি অভিজ্ঞ বিচারক ছিলেন। তবে তিনি উকীলদের সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার অবসর-গ্রহণের সময়ে উকীলেরা তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দিয়াছিলেন কি না তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

বিচারপতি বাবু দ্বারিকানাথ মিত্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ইনি যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তাহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইনি অতীব যোগ্য ও স্বাধীনচেতা বিচারপতি ছিলেন। বিচারপতি মিষ্টার জ্যাকসন (পরে স্যর লুইস জ্যাকসন) বুদ্ধিমান ও দক্ষ বিচারক ছিলেন। কোনও জজ তাঁহার সহিত বিচার করিতে বসিলে জ্যাকসন সাহেবের রায়েই তাঁহাকে রায় দিতে হইত। বিচারপতি দ্বারিকানাথকে এই জ্যাকসন সাহেব

বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না। দ্বারিকানাথও তাঁহার সহিত একত্র বিচার করিতে বসিতে চাহিতেন না। কারণ জ্যাকসন সাহেব তাঁহার অপেক্ষা সিনিয়র ছিলেন। একবার কয়েকমাসের জন্য দ্বারিকানাথ বাবু জ্যাকসন সাহেবের সহিত বিচারাসনে বসিয়াছিলেন। যাঁহারা এজলাসে ইঁহাদের দুইজনের বিচারকার্য্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়ই দেখিয়াছেন যে, দ্বারিকা বাবু ও জ্যাকসন সাহেবের মধ্যে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। একবার একটী আপীল-মামলার সওয়াল শেষ হইবার পর জ্যাকসন সাহেব বলেন—এই আপীল খারিজ করা উচিত; কিন্তু দ্বারিকা বাবু বলেন—আপীলে যাহা প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা পূর্ণ করা উচিত। ইহার ফলে মামলাটীর পুনরায় সওয়াল হইল এবং শেষে দ্বারিকা বাবুর মীমাংসাই বজায় রহিল।

জজ দ্বারিকানাথ মিত্রের পর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্থলে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। রমেশচন্দ্র জজ হইলে উকীলেরা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি জজ-হিসাবে প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে সুদক্ষ ও পরিশ্রমী বিচারক ছিলেন তাহা নহে, তিনি অত্যন্ত তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ও বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। যে কোনও কারণেই হউক, অন্যান্য জজেরা তাঁহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। সম্ভবতঃ রমেশচন্দ্র তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাহিতেন না বা তাঁহাদের সহিত বনাইয়া চলিবার কৌশল তিনি জানিতেন না। স্যর রিচার্ড গার্থ অথবা স্যর কোমার পেথারাম কেহই তাঁহাকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতেন না। রমেশ বাবু ভদ্র ও সজ্জন ছিলেন, কিন্তু দ্বারিকানাথের মত উচ্চান্তঃকরণ তিনি ছিলেন না। কেহ তাঁহার সহিত মন্দ ব্যবহার করিলে তিনি তাহা প্রায়ই ভুলিতে পারিতেন না। রমেশ বাবু দুইবার অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বহুদিন জজীয়তী করিয়া হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁহাকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

এই বৎসরই অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ডব্লিউ এফ ম্যাকডোন্যাল্ড ভি-সি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন। ইনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে আরার কলেক্টর ছিলেন। তিনি বড় নিরীহ ও ভাল লোক ছিলেন এবং সকলেরই সহিত শিষ্ট ও সদয় ব্যবহার করিতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি বিচারশক্তির তাদৃশ পরিচয় দিতে পারেন নাই। চন্দ্রমাধব বাবু যখন উকীল ছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন; তার পর চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের জজ হইলেও ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেবের নিকট হইতে তিনি সেইরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়া চন্দ্রমাধব বাবু ও ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব দুইজনে একত্র বিচার করিতে বসিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার জুনিয়র হইলেও তিনি প্রায়ই তাঁহাকে রায় দিতে বলিতেন। ম্যাকডোন্যাল্ড সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, অনেক দিন ধরিয়া বিচারপতি জ্যাকসনের সহিত একত্র বসিয়া বিচার করিতে হইয়াছিল বলিয়া রায় দিবার সুযোগ আমার হয় নাই; কারণ জ্যাকসন সাহেব সে সুযোগ আমাকে দেন নাই। কাজেই এজলাসে বসিয়া রায় দিবার অভ্যাস আমার হয় নাই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড কাউচ অবসর গ্রহণ করেন এবং স্যর রিচার্ড গার্থ তাঁহার স্থলে প্রধান বিচারপতি-পদে নিয়োজিত হয়েন। কিন্তু তিনি ইংলণ্ড হইতে এখানে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিচারপতি মিষ্টার এ-জি ম্যাকফারসন (পরে স্যর) সামান্য কিছুদিন অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ম্যাকফারসন সাহেব কিন্তু সিনিয়র পিউনী জজ ছিলেন না। স্যর রিচার্ড গার্থ শ্রমশীল, স্বাধীনচেতা, বিবেকবুদ্ধি

পরায়ণ, নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন। বিচারকার্য্যে তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি নিক্তির তৌলে ন্যায়বিচার করিতেন। তিনি সমদর্শী ছিলেন। সিনিয়র ও জুনিয়র ব্যারিষ্টারে এবং ব্যারিষ্টারে ও উকীলে কোনও ভেদ তিনি করিতেন না। তিনি সকলের কথাই মনোযোগ দিয়া শুনিতেন এবং সকলের সহিত ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার এজলাসে একবার এডভোকেট-জেনারল স্তর চার্লস পল একটি বিষয়ে নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাস করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সেই বক্তৃতায় যুক্তি-তর্ক কিছুই ছিল না। স্তর রিচার্ড গার্থ কিছুক্ষণ তাঁহার এই ফাঁকা বক্তৃতা শুনেন ; তার পর তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—আপনার সওয়াল জবাবে সার কথা কিছুই নাই—যাহা বলিতেছেন তাহা সমস্তই যুক্তিহীন। এই কথা শুনিয়া স্যর চার্লস পল বসিয়া পড়েন। অনেক দিন ধরিয়া সরকার ও সিভিলিয়ানী প্রভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু পরে কি কারণে জানি না, এইরূপ প্রভাবের সংস্পর্শে পড়িবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে আদালতে বিচার-সম্পর্কীয় ব্যাপারে তিনি সকল প্রভাবেরই অতীত ছিলেন ; শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাকে সরকারী প্রভাবের সংস্পৃষ্ট মনে হইত। আর এক কথা, পূর্ব্বে ভারতীয়গণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি অধিক ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে উহার হ্রাস পাইতে থাকে। এ সম্বন্ধে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিচারপতি মিষ্টার লুইস জ্যাকসন পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থকে তাঁহার পদের জন্য একজন বিচারপতিকে মনোনীত করিতে বলেন। তদনুসারে স্যর রিচার্ড কয়েকজন সিনিয়র জজের সহিত পরামর্শ করিয়া মিষ্টার ফিল্ড নামক জনৈক জেলা-জজকে সুপারিশ করেন এবং তাঁহার নাম বড়লাটের

নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পরামর্শ করিবার সময়ে বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, বড়লাট পরে তাঁহাকে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক—যাঁহাকে উক্ত পদের জন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে—তাঁহার নাম পাঠাইয়া দিতে তারযোগে অনুরোধ করেন। তখন প্রধান বিচারপতি মহাশয় সমস্যায় পড়েন এবং ইতিপূর্ব্বে যে সকল বিচারপতির সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় পরামর্শ করেন। তাঁহারা এবার চন্দ্রমাধব বাবুর নাম পাঠাইয়া দিতে বলেন। কাজেই স্যর রিচার্ড চন্দ্রমাধব বাবুর নাম তারযোগে বড়লাটের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ডাকযোগে বড়লাট বাহাদুরকে এই মর্ম্মে এক চিঠি পাঠাইয়া দেন যে, যদিও তাঁহার অনুরোধে চন্দ্রমাধব বাবুর নাম পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু ইহা জানিবেন যে, ফিল্ড সাহেব নিযুক্ত হইলে হাইকোর্টের লাভ হইবে ; তাঁহাকে এই পদ না দিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। ইহার ফলে ফিল্ড সাহেবই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন।

প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ সাদাসিদা লোক ছিলেন। তিনি ফিল্ড সাহেবের নিয়োগ সম্বন্ধে বিচারপতি রমেশচন্দ্রকে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল সমস্তই খুলিয়া বলেন। রমেশচন্দ্র চন্দ্রমাধব বাবুকে এই সকল কথা বলিয়া দেন এবং আরও বলেন,—"চন্দ্রমাধব বাবু ! আপনি গার্থ সাহেবকে আপনার বন্ধু মনে করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন।" চন্দ্রমাধব বাবু ইহার উত্তরে বলেন,—"জজীয়তী আমি পাইলাম না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া গার্থ সাহেবের সারল্য ও বিবেকপ্রবণতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস ইহাতে একটুও কমে নাই। আমার ধারণা, গার্থ সাহেবের অকপট বিশ্বাস যে, ফিল্ড সাহেব যোগ্যতর ব্যক্তি সুতরাং তাঁহাকেই জজীয়তী দেওয়া উচিত।"

রমেশচন্দ্র অবশ্য চন্দ্রমাধব বাবুর এই মন্তব্য সঙ্গত মনে করেন নাই।

আর একটী ঘটনার কথাও এইখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঘটনাটী এই —১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্যর রিচার্ড গার্থ বিলাতে যাইবার জন্য ছুটী লয়েন। সেই সময়ে রমেশচন্দ্র ছিলেন সিনিয়র পিউনি জজ। গার্থ সাহেব ছুটী লইলে তাঁহার স্থলে প্রধান বিচারপতির কার্য্য কোন্ জজ করিবেন তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে গার্থ সাহেবের অভিমত চাহিয়া পাঠান। তিনি বলেন,— রমেশচন্দ্রকে প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিতে দিতে পারা যায় না। কারণ, প্রধান বিচারপতিকে অন্যান্য কর্ত্তব্যের সহিত কতকগুলি সামাজিক ব্যাপারেও যোগ দিতে হয়। ভারতীয় বিচারপতির পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্ট কিন্তু তাঁহার এই আপত্তি গ্রহণ করেন নাই ; তাঁহারা রমেশচন্দ্রকেই অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান বিচারপতি গার্থের ভারতীয়দের প্রতি পূর্ব্ব সহানুভূতি হ্রাস পাইতেছিল। কিন্তু অবসর-গ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার সহানুভূতি আবার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়। চন্দ্রমাধব বাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার খুবই উচ্চধারণা ছিল। এক ভোজ-সভায় জনৈক ইংরেজ ব্যারিষ্টারের নিকট তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ব্যারিষ্টার মহাশয় পরে গার্থ সাহেবের কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। গার্থ সাহেব বলিয়া ছিলেন—চন্দ্রমাধব বাবুর ইংরেজের মত মেরুদণ্ড আছে (He has the back-bone of an Englishman)। গার্থ সাহেব ও চন্দ্রমাধব বাবু একত্র কোন প্রকাশ্য সভায় নিমন্ত্রিত হইলে তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর উপর অত্যন্ত অধিক মনোযোগ দিতেন।

একবার উকীল শ্রীনাথ দাস মহাশয় হাইকোর্টের আদিম বিভাগে একটি

হ্যাণ্ডনোটের মামলা আনেন। এক ব্যক্তি দাস মহাশয়ের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল; টাকা দাস মহাশয়ই দিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যাণ্ডনোটখানায় তাঁহার একজন আত্মীয়ের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইল বলিয়া লেখা ছিল। মামলার শুনানি হইবার সময়ে প্রধান বিচারপতি মহাশয়ের এজলাসে এই বেনামী ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহাতে গার্থ সাহেব খুবই চটিয়া যান এবং দাস মহাশয়কে বলেন,—আপনি উকীল হইয়া এরূপ বেনামী কার্য্য কেন করিলেন তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। ইহাতে শ্রীনাথ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এইদিন অপরাহ্ণে বা তৎপরদিন অপরাহ্ণে লর্ড বিশপের বাটীতে একটি বড়গোছের সান্ধ্য-সম্মিলনে প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব ও চন্দ্রমাধব বাবু উভয়েই নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তথায় দুইজনে সাক্ষাৎ হওয়ায় কথা-প্রসঙ্গে চন্দ্রমাধব বাবু গার্থ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "শ্রীনাথ বাবুর মামলার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি? ব্যাপারটা কি ঘটিয়াছে?" গার্থ সাহেব তাঁহাকে আদালতে যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলেন। তখন চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাকে ব্যাপারটী বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে গার্থ সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলেন,—"আমি এখানে কিছু শুনিতে চাহি না; যদি কিছু আপনার বলিবার থাকে তবে প্রকাশ্য আদালতে বলিবেন।" চন্দ্রমাধব বাবু গার্থ সাহেবের নিকট এরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন নাই। তাই তিনি তখনই এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া যায়েন যে, শ্রীনাথ বাবু এই ব্যাপারে আমাকে মধ্যস্থতা করিতেও বলেন নাই, অথবা এই মামলা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত শ্রীনাথ বাবুর কোনও কথাও হয় নাই। গার্থ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর এই কথায় তাঁহার অন্যায় বুঝিতে পারেন এবং বিশ্বাস করেন যে, তিনি শ্রীনাথ বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতেও আসেন নাই। তাই তখনই তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে

ডাকাইয়া আনিয়া ঐ ব্যাপার সম্বন্ধেই তাঁহার সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। চন্দ্রমাধব বাবু বলেন,—"শ্রীনাথ বাবু এরূপ অন্যায় কাজ করিতে পারেন না এবং করেন নাই।" গার্থ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট সকল কথা শুনিয়া শ্রীনাথ বাবুকে যে কৈফিয়ৎ দিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যাহার করেন। চন্দ্রমাধব বাবু পরে এই ঘটনা শ্রীনাথ বাবুর নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, গার্থ সাহেবের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধুত্ব বহুকাল অটুট ছিল। এমন কি, অবসর-গ্রহণের পর ইংলণ্ডে অবস্থান করিবার সময়েও তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত সৌহৃর্দ্দ্যপূর্ণ পত্র ব্যবহার করিতেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এইচ-বি লফোর্ড হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। ইনি পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কলেক্টর ছিলেন এবং পরে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার হয়েন। তাহার পর জেলা-জজ হইয়াছিলেন। তিনি হাইকোর্টে বেশীদিন জজীয়তী করেন নাই। জজ-হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

মিষ্টার জে-এস হোয়াইট ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েন। তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা, ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, ব্যবহার-শাস্ত্রে প্রভূত অধিকারশালী, ভদ্র ও সদয়হৃদয় বিচারক ছিলেন। মামলা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইত; বিচারপতি মিষ্টার ফিয়ার্সের বা মিষ্টার ফণ্টির (Mr Phonti) ন্যায় মামলা তিনি চটপট বুঝিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বিচার-ফল সকলের সন্তোষজনক হইত এবং রায়ের উপর সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল। চন্দ্রমাধব বাবুর উচ্চগুণগ্রামের তিনি খুব প্রশংসা করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু কখনও তাঁহার সহিত এজলাসের বাহিরে দেখা-সাক্ষাৎ করেন নাই বটে, তথাপি তিনি অন্যান্য উকীল-ব্যারিষ্টারের নিকট তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার জে পিট কেনেডি হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হয়েন। তিনি হাইকোর্টের অন্যতম সিনিয়র ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; আইনেও তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও জজ-হিসাবে তিনি নাম কিনিতে পারেন নাই। তিনি অতি অল্পদিনই জজীয়তী করিয়াছিলেন।

এই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে হুগলীর জেলা-জজ মিষ্টার এইচ-টি প্রিন্সেপ (পরে স্তর হেনরী প্রিন্সেপ) হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। যখন চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা চট্টগ্রামের ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন, সেই সময়ে প্রিন্সেপ সাহেব তথাকার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেইজন্য চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার সহিত প্রিন্সেপ সাহেবের পরিচয় ছিল। ১৮৬৪ অথবা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার ছিলেন; সেই সময়ে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। প্রিন্সেপ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিতেন। অভিজ্ঞ ফৌজদারী বিচারক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। "Princep's Criminal Procedure Code" নামক বিখ্যাত ফৌজদারী আইনের গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রিন্সেপ-পরিবার বঙ্গদেশে সুপরিচিত। কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কেহ কেহ সিবিলিয়ান ছিলেন এবং তাঁহাদেরই মধ্যে একজনের নামে গঙ্গার একটী ঘাট আছে প্রিন্সেপ ঘাট। ফৌজদারী জজ-হিসাবে প্রিন্সেপ সাহেবের যত নাম ছিল দেওয়ানী জজ বলিয়া তাঁহার তত নাম ছিল না। বহুকাল হাইকোর্টে জজীয়তী করিবার পরও তিনি দেওয়ানী মামলার বিচার-কার্য্যে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; কিন্তু ফৌজদারী মামলার বিচারক-হিসাবে তাঁহার প্রভূত সুনাম হইয়াছিল। নিম্ন আদালতের হাকিমের রায় দায়রা-জজ বা জেলা-জজ কর্ত্তৃক

সমর্থিত হইলে তিনি সাধারণতঃ উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল—তিনি ফৌজদারী আইনে বিশেষজ্ঞ। এই ধারণার বশে সময়ে সময়ে তিনি মামলা সম্বন্ধে নিজের অভিমতের উপরই বেশী নির্ভর করিতেন; সাক্ষ্য-প্রমাণের ধারা ধরিয়া বিচার করিতে ভালবাসিতেন না। চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর বহুকাল তিনি ও মিষ্টার প্রিন্সেপ একত্র বসিয়া দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুইরকম মামলারই বিচার করিয়াছিলেন। দেওয়ানী মামলার বিচারে ইঁহাদের দুইজনের মতবিরোধ ঘটিত না, ঘটিলেও তাহা কদাচিৎ। কিন্তু ফৌজদারী মামলার বিচারে তাঁহাদের প্রায়ই মতবিরোধ উপস্থিত হইত। অথচ উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব হইত না; তথাপি যে মতবিরোধ হইত, তাহার কারণ—ফৌজদারী আইনে তিনি অদ্বিতীয় এই আত্মাভিমান। এইরূপ মত-বিরোধ ঘটিলে চন্দ্রমাধব বাবু তাহা প্রধান বিচারপতির গোচর করিতে বাধ্য হইতেন। হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়ে প্রিন্সেপ সাহেব জুরী কমিশনের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েন এবং কিছুদিন তিনি হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতিও হইয়াছিলেন। বহুকাল হাইকোর্টে বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সরকার তাঁহাকে স্যর ও কে-সি-আই-ই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এইচ-এস কানিংহ্যাম (পরে স্যর হেনরী কানিংহ্যাম) হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট স্যর হেনরী লরেন্সের জামাতা ছিলেন। সম্ভবতঃ কানিংহ্যাম সাহেব পঞ্জাব চীফ কোর্টের এডভোকেট অথবা পিউনি জজ ছিলেন। তাঁহার নিয়োগে হাইকোর্টে সন্তোষের সঞ্চার হয় নাই। তিনিও বিচারক-হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারেন

নাই। তবে তিনি সজ্জন ও সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপর চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর একজন হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন; তাঁহার নাম মিষ্টার আর-এল টটেনহ্যাম। ইনি পূর্ব্বে মেদিনীপুরের জেলা-জজ ছিলেন। তিনি অতি নিরীহ, ভদ্র ও সদয়হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। জজ-হিসাবে তিনি পণ্ডিত বা তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বরং তিনি কিছু দুর্ব্বলচিত্তই ছিলেন। তবে তাঁহার জজীয়তীর শেষাশেষি তিনি মামলার শুনানীর পরই তৎক্ষণাৎ রায় দিতে এরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইত এবং তাঁহার সেই রায়ে একটীও ভুল থাকিত না। তাঁহার শিষ্টাচারের জন্য উকীল-ব্যারিষ্টার সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু জজ হইয়া অনেককাল তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া বিচার করিয়াছেন এবং উভয়ে সদ্ভাবে সৌহার্দ্দ্যেই কাটাইয়াছেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে চন্দ্রমাধব বাবু অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কারণ টটেনহ্যাম সাহেব কেবল যে তাঁহার সহযোগী ছিলেন তাহা নহে, একজন বন্ধুও ছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের এডমিনিষ্ট্রেটর-জেনারেল মিষ্টার ব্রাউটন কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। জজ-হিসাবে তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই; সামান্য কিছুদিন জজীয়তী করিয়া তিনি পুনরায় তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্মে ফিরিয়া যায়েন।

এই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার এ-জে ম্যাকলিন হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হয়েন। ইনি ২৪ পরগণার জেলা-জজ ছিলেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতে থাকেন—হাইকোর্টে আর একজন

দেশীয় জজ নিযুক্ত করা হইবে কি না। আর একজন দেশীয় জজ নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কর্ত্তৃপক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই সময়ে হাইকোর্টে খুবই জনরব রটিয়াছিল যে, চন্দ্রমাধব বাবুকে এইবার হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করা হইবে। কয়েকজন বিচারপতির সন্দেহও হইয়াছিল যে চন্দ্রমাধব বাবু ওকালতীর বিপুল আয় ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টের জজীয়তী লইবেন কি না। এই গুজবের ভিত্তি নিতান্ত অমূলক ছিল না। কারণ, ম্যাকলিন সাহেব স্বয়ং উকীল বাবু দুর্গামোহন দাশকে বলিয়াছিলেন, "হাইকোর্টে যে স্থায়ী জজের পদ খালি হইয়াছে উহাতে একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিবার কথা উঠিয়াছে। যদি ঐ পদে ভারতবাসী নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে আমি অবসর গ্রহণ করিব। কারণ, ঐ স্থায়ী পদে নিযুক্ত হইবার আমারই অধিকার।" সম্ভবতঃ আর একজন ভারতীয় জজ নিয়োগের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উঠিয়াছিল বলিয়া হাইকোর্টে তখন ভারতীয় জজ নিযুক্ত হইবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ফলে ম্যাকলিন সাহেবের নিয়োগ কায়েমী হইয়া যায়। ম্যাকলিন সাহেব জজ-হিসাবে তাদৃশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে একজন জজ হাইকোর্টে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার নাম মিষ্টার এ উইলসন (পরে স্যর আর্থার উইলসন)। তিনি যোগ্য, আইনজ্ঞ, শ্রমশীল, স্থিরধীর ও ধর্ম্মভীরু বিচারক ছিলেন। সকলের প্রতি তিনি শিষ্ট ব্যবহার করিতেন এবং বিচারক-হিসাবে তিনি সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকালের শেষাশেষি তিনি ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতির অভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। বহুকাল চন্দ্রমাধব বাবু ও উইলসন সাহেবের বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু পরে তাঁহাদের উভয়ে বনিবনাও হইত না। সম্ভবতঃ ইহার হেতু—চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত

বিচারপতি মিষ্টার পিগটের মতবিরোধ ছিল এবং পিগট সাহেব উইলসন সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিগট সাহেব উকীলদিগের সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না; সেইজন্য তিনি অবসর গ্রহণ করিলে উকীলেরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন নাই। সে যাহা হউক, উইলসন সাহেব হাইকোর্টে তাঁহার যোগ্যতা ও সূক্ষ্মবিচার-শক্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি স্তর রিচার্ড গার্থ কিছুদিনের ছুটী লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। সেই সময়ে তদানীন্তন সিনিয়র পিউনি জজ মিষ্টার এল-এস জ্যাকসন তাঁহার স্থলে অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু এই বৎসরেই জ্যাকসন সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবসর লইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সকল শ্রেণীর লোকে তিনি দীর্ঘকাল হাইকোর্টে জজীয়তী করিতেছেন বলিয়া এত বেশী আলোচনা আরম্ভ করেন যে, তিনি আর অবসর গ্রহণ অনুচিত মনে করেন। এই জ্যাকসন সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে জেলা-জজ মিষ্টার ফিল্ড তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে একজন ভারতীয়কে জ্যাকসন সাহেবের পদে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা বড়লাট করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফিল্ড সাহেব খুব পরিশ্রমী ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত "Law of Evidence" এবং "Field's" Regulations" নামক দুই খানি আইনের কেতাব সুপ্রসিদ্ধ। ইনি উকীলদের সহিত বড় কর্কশ ব্যবহার করিতেন বলিয়া উকীলেরাও তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। জজ-হিসাবে তিনিও তেমন সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নলিনীর সহিত বাবু জগদীশচন্দ্র রায়ের বিবাহ হয়। তিনি এক্ষণে পরোলোকগত।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব তিন মাসের ছুটী লইয়া বিলাতে গমন করেন। সেই সময়ে বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র সিনিয়র পিউনি জজ ছিলেন বলিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপণ তাঁহাকেই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন। ইঁহার নিয়োগের বিরুদ্ধে গার্থ সাহেব যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড রিপণ সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই।

প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব ছুটী লইয়া স্বদেশে গমন করিবার পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করেন যে, হাইকোর্টে বিস্তর মামলা জমিয়া গিয়াছে সেইগুলির বিচারকার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য ছয় মাসের জন্য একজন অতিরিক্ত জজ নিযুক্ত করা হইবে এবং সেই অতিরিক্ত জজ ভারতবাসী হইবেন। কারণ মামলা আদিম বিভাগ অপেক্ষা আপীলবিভাগেই বেশী জমিয়াছে। এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, কিছুদিন হইল ভারত-সচিব এইরূপ একটি নিয়ম করেন যে, হাইকোর্টের দেশীয় জজেরা ইউরোপীয় জজদের বেতনের অপেক্ষা তিন ভাগের এক ভাগ বেতন কম পাইবেন। ষ্ট্যাটুটরী সিবিলিয়ানগণের বেতন সম্বন্ধে বিলাতের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটী নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টে এরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়ায় জজেরা সকলেই বুঝিলেন যে, বেতনের এই অল্পতার জন্য ভাল পশারওয়ালা উকীলেরা আর জজ হইতে চাহিবেন না। সেইজন্য অতিরিক্ত জজের পদে কোন্ উকীল নিযুক্ত হইতে চাহিবেন তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ বিচারপতি একদিন কথা-প্রসঙ্গে চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনাকে যদি এই অতিরিক্ত জজের পদ দেওয়া হয়, আপনি উহা লহেন কি?" ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু উত্তর

দেন,—"না, লই না।" বিচারপতি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—"বেতনের অল্পতাই কি ইহার কারণ?" চন্দ্রমাধব বলেন,—"না, বেতনের অল্পতাই একমাত্র কারণ নহে। ইউরোপীয় ও দেশীয় জজের বেতনে তারতম্য করিয়া যে বৈষম্যের রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা অন্যায়। ইহার ফলে কোনও দেশীয় জজ তাঁহার সহযোগী ইউরোপীয় জজের সহিত একত্র বিচার করিতে বসিলে কেবলই সেই দেশীয় জজের মনে হইবে—আমি ইউরোপীয় জজের তুল্য নহি এবং এই ভাব মনে হইলে তিনি স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পারিবেন না। যদি দেশীয় জজের বেতনের সমান বেতন ইউরোপীয় জজদেরও করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি জজ হইতে সম্মত আছি।" সম্ভবতঃ এই মন্তব্য উক্ত জজসাহেবের প্রীতিকর হয় নাই। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর অভিমতের কোনও উত্তর দেন নাই।

তৎপরে পূজার ছুটীর সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু ও বিচারপতি স্তর রমেশচন্দ্র মিত্র দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান করিবার সময়ে রমেশচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রমাধব বাবু উক্ত জজের সহিত দেখা করিতে গমন করেন। উদ্দেশ্য—তাঁহাকে এবং অন্যান্য জজদিগকে বলিয়া কহিয়া উকীল বাবু মোহিনী মোহন রায়কে উক্ত অতিরিক্ত জজের পদের জন্য সুপারিশ করা। রমেশচন্দ্র ও চন্দ্রমাধব বাবু উভয়েই মনে করিয়াছিলেন,—পদের মর্য্যাদার জন্য মোহিনীবাবু বেতনের অল্পতার দিকে যাহাতে লক্ষ্য না করেন, তেমন ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। কিন্তু উক্ত জজ সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে বলেন যে, সর্ব্বপ্রধান উকীলেরই এই পদ লাভের সম্ভাবনা আছে; মোহিনীবাবু বা অপর কাহারও ইহা প্রাপ্তির আশা নাই।

অতঃপর বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। ইনি প্রথম শ্রেণীর সবজজ ছিলেন এবং ইঁহার বেতন মাসিক ১০০০৲ একহাজার টাকা ছিল। কিন্তু মহেন্দ্রনাথের নিয়োগে লোকে সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই।

এদিকে হাইকোর্টের ইউরোপীয় ও দেশীয় জজদিগের বেতনের বৈষম্য দূর করিবার জন্য চন্দ্রমাধব বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি কয়েকজন বড় বড় ব্যারিষ্টারকে এই বৈষম্যের কথা বলেন এবং ইহাতে যোগ্য ব্যক্তিরা হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিতে চাহিবেন না—এ কথাও তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ব্যারিষ্টার মিষ্টার হেনরী বেল এই কথার যৌক্তিকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ইনি অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান ছিলেন। বড় বড় উকীল, এটর্নী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের বড় বড় সদস্য প্রভৃতিতে এই বৈষম্যের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দেন। মিষ্টার হেনরী বেল এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করেন। তিনি এরূপ চেষ্টা না করিলে এই বৈষম্য দূরীভূত হইত কি না সন্দেহ। অবশেষে স্থির হইল যে, ভারত-সচিবের নিকট সকলের সম্মিলিত আবেদন-পত্র পাঠাইতে হইবে এবং তাহাতে এই বেতনগত বৈষম্য বিদূরিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। এই আবেদন-পত্রের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ভারত-সচিব হাইকোর্টের জজদিগের বেতনের বৈষম্য-মূলক নিয়ম উঠাইয়া দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই ব্যাপার ঘটে।

বিচারপতি মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালনে অবহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বহুকাল অধস্তন বিচার-বিভাগে কার্য্য করায় তিনি পূর্ণ স্বাধীনচেতা হইবার সুযোগ লাভ করেন নাই। ইহার উপর মাত্র ছয়মাস তিনি অস্থায়ীভাবে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া হাইকোর্টে জজীয়তীতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ মহেন্দ্রবাবু ৮মাস কাজ করিয়াছিলেন। অবশ্য মফঃস্বল হইতে আগত জেলা-জজেরা হাইকোর্টে আসিয়া যেরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া থাকেন তদপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প যোগ্যতা মহেন্দ্রবাবু দেখান

নাই; সর্ব্বাংশে তিনি তাঁহাদের সমতুল্যই ছিলেন বা তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা ভাল ছিলেন। কিন্তু হাইকোর্টে দেশীয় জজদিগের অবস্থা বড় সুবিধাজনক নহে। তাঁহারা যদি অন্যান্য জজদিগের অপেক্ষা অধিক যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লোকে অনুপযুক্ত মনে করে। বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়াই রায় দিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অপর একজন দেশীয় বিচারপতি মনোনয়ন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের জজদিগকে অনুরোধ করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার ডব্লিউ ম্যাকফারসনকে (পরে স্তর উইলিয়াম ম্যাকফারসন) হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, ভদ্র, শিষ্টাচারপরায়ণ, যোগ্য বিচারপতি ছিলেন। দুই একবার ফৌজদারী মামলার বিচারে পক্ষপাতিত্বের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই মামলার আসামী ছিল ইউরোপীয়। কিন্তু মোটের উপর, তাঁহার কাজ ভালই ছিল। সিবিলিয়ান জজদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম হাইকোর্টের আদিম বিভাগে বিচার করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য তিনি প্রায় এক বৎসর কাল সুচারুভাবেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু ও ম্যাকফারসন সাহেব যখন একত্র বিচারকার্য্য করিতেন তখন তাঁহাদের মতবিরোধ ঘটিত না; দুইজনে প্রায় একমত হইয়া কাজ করিতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। যখন চন্দ্রমাধববাবু জজীয়তী গ্রহণ করেন, তখন সংবাদপত্রসমূহ তাঁহার বিষয়ে লেখেন যে, সেই সময়ে তিনি উকীলগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১৮৮৫—১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল তিনি হাইকোর্টের জজীয়তী করিয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি

একবারমাত্র অল্পকালের জন্য ছুটী লইয়াছিলেন। বিচারপতি হিসাবে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উকীল ও মক্কেল সকলেই তাঁহার নিরপেক্ষ সূক্ষ্মবিচারশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইত। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের রীতি-নীতি,ভূমিরাজস্ব প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে তাঁহার জানা থাকায় তিনি অতি সুন্দর বিচারশক্তির পরিচয় দিতেন। ১৯০৬ সালের ১১ই মে হইতে ৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত আড়াই মাসের জন্য তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই নিয়োগ-সম্বন্ধে "বেঙ্গলী" লিখিয়াছিলেন—"It goes without saying that the selection of Mr. Justice Ghosh to officiate as Chief Justice of the High Court during the absence of Sir Francis Maclean has given unqualified satisfaction throughout Bengal." অর্থাৎ মিঃ ঘোষকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করায় বঙ্গবাসী-মাত্রই আনন্দিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যোগ্য ভারতবাসীকে এইরূপ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবাসীর দাবী স্বীকার করিয়াছেন; সেজন্য গভর্ণমেণ্টেকেও ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। "পাইওনীয়র" পত্রও লেখেন—"মিঃ জষ্টিস্ ঘোষ—যিনি হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলি হাইকোর্ট আছে এবং তাহাতে যতগুলি দেশীয় বিচারপতি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ২১ বৎসরকাল তিনি হাইকোর্টের জজীয়তী করিয়াছেন, এই একুশ বৎসরের মধ্যে তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন। তিনি উকীল, ব্যারিষ্টার ও মক্কেলদের প্রতি ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহার করেন। গত ৫০ বৎসর-কাল তিনি আইনের ক্ষেত্রে থাকায় অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের আইন-

বেত্তা; সুতরাং প্রাচীন ও নবীন আইন-পন্থীদের তিনি সংযোগস্থল। তাঁহার আদিনিবাস পূর্ব্ববঙ্গ। তিনি আজ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার পিতৃ-পিতামহের আচার-অনুষ্ঠান বিস্মৃত হন নাই; এই কারণে তিনি ইউরোপীয় সমাজে তেমন মিশিতে পারেন না। তাঁহার ন্যায় প্রগাঢ় আইন-বেত্তার জীবনী প্রত্যেক যুবকের অনুকরণীয়।"

১৯০৬ সালে সম্রাটের জন্মদিন-উপলক্ষে তিনি "নাইট" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ সালের ২রা জানুয়ারী তিনি জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যেদিন অবসর গ্রহণ করেন, সেদিন হাইকোর্টের উকীল ও এটর্নীরা তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দিয়াছিলেন। তিনি সেই বিদায়-অভিনন্দনের উত্তরে অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন—"আজ আমার প্রাণে যে কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। ২৪ বৎসর বয়সের সময় আমি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করি, ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আমি ওকালতী করিতে থাকি এবং ঐ সময়ে আমি হাইকোর্টের জজ হই। প্রায় ২২ বৎসর হইল, আমি হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিয়াছি। এত দীর্ঘকাল পরে হাইকোর্টের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে আমার যে কষ্ট হইতেছে না, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আমি যে এখনও শারীরিক ও মানসিক শক্তি লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে পারিলাম, এজন্য আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার অবশিষ্ট জীবন যেন জনহিতকর কার্য্যে অতিবাহিত হয়, এজন্য আমি ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিতেছি।"

১৯১১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের উকীল-লাইব্রেরীতে স্যর চন্দ্রমাধবের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন-প্রসঙ্গে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স বলেন—"চন্দ্রমাধব বাবু আমার পুরাতন বন্ধু। তিনি বহুদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং

বহুদিন তাঁহার স্মৃতি আমাদের মনে জাগরূক থাকিবে। স্তর চন্দ্রমাধব বহুকাল জজীয়তী করিয়া হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে নাইট উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। তিনি অতি বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ছিলেন।"

স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ বহুবর্ষ যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক যাবতীয় শিক্ষা-ব্যাপারে তিনি জড়িত থাকিতেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন; কিন্তু কয়েকমাস পরে হাইকোর্টের জজ-পদে নিযুক্ত হওয়ায় তিনি কয়েকমাস মাত্র ব্যবস্থাপক সভায় ছিলেন। হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিবার পর তিনি এ সহরের যে অংশে ইউরোপীয়েরা বাস করেন সেই অংশে অর্থাৎ ভবানীপুরে যথায় তাঁহার পূর্ব্ব গৃহ ছিল তথায় বাস করিতে থাকেন। এই বাটীতে তাঁহার স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু দরিদ্র ছাত্র থাকিয়া আহার করিত ও স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিত। তিনি তাহাদের পড়িবার ব্যয় নিজে বহন করিতেন। স্বগ্রামের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। স্বগ্রামে একটি স্কুল ও একটি ডিস্‌পেন্‌সারী প্রতিষ্ঠা-কল্পে তিনি বহু টাকা দান করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকদিগকেও তিনি আপদে-বিপদে গোপনে অনেক দান করিতেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যে ভারতীয় সামাজিক কন্‌ফারেনস হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসর কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতিও হয়। কায়স্থ সমাজের উন্নতি কল্পে তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কায়স্থজাতির মধ্যে যে বিভিন্ন শাখা আছে সেগুলির মধ্যে অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী প্রভৃতিতে যাহাতে বিবাহ হয়, এজন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজ বংশে ও দক্ষিণরাঢ়ীয় বংশে

কুটুম্বিতা করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। কলিকাতায় যে বিক্রমপুর-সম্মিলনী নামক সভা আছে তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। কলিকাতার ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ১৯১৭ সালে মিসেস্ বেসান্তের নির্ব্বাসনের প্রতিবাদের জন্য কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয় তিনি তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে যাহাতে মিলন হয় সেজন্য তিনি তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাটীতে একটি পরামর্শ-সভার অধিবেশন করেন। ইহা ব্যতীত জীবনে তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই।

বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় তিনি বহুকাল কোন আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। তবে ১৯১৭ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দুইটি সভার সভাপতিত্ব করেন। প্রথম সভাটি মিঃ রসুলের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটীতে হয়; দ্বিতীয় সভা মিসেস্ বেসান্ত ও তাঁহার দুই জন সঙ্গীকে মুক্তি দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিবার জন্য টাউন হলে হয়। প্রথম সভায় তিনি বলেন যে, যদিও তিনি দৃষ্টিশক্তি না থাকায় একরূপ অন্ধের মত হইয়াছেন, তথাচ তিনি একজন বন্ধুর মত বন্ধু হারাইয়াছেন বলিয়া সভায় আসিয়াছেন। রসুলের উদার অন্তঃকরণ ও সৎসাহস ছিল। সকল জাতির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ১৯০৩ সালে তিনি যখন হাইকোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি তখন তাঁহার বাটীতে একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুরা তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, অনেক গোঁড়া হিন্দু তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে বসাইয়া একত্র খাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সভা অর্থাৎ টাউন হলের সভায় স্যর চন্দ্রমাধব নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন—"সর্ব্বাগ্রে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান

করিতেছি, যেহেতু আপনারা আমাকে সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন। বহুদিন হইতে আমি রোগে ভুগিতেছি, কাজেই এত বড় সভায় আমি সভাপতিত্ব করিতে অপারগ। আপনারা ইহাও জানেন যে,আমি কংগ্রেস কিংবা হোমরুল লীগ ইহার কোন দলভুক্তই নহি। তথাচ আমি দেশবাসীর অনুরোধে—আমার এক্ষেত্রে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই পালন করিতে আসিয়াছি। হয় ত আমি শ্রীমতী বেসান্ত ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত কোনও কোনও বিষয়ে একমত নহি, কিন্তু একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন তৎসমস্তই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত অথচ তাঁহারা মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদিগকে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া সেই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন। এজন্য মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের একটুও দুঃখিত হওয়া উচিত নহে। আজ আমরা ইঁহাদিগকে আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। ইঁহারা সত্যই বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তরীণের সময় দেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল এখন তাহা বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করি এবং সকল সম্প্রদায় দেখিবেন যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ মনোমালিন্য ও গোলমালের সৃষ্টি না হয়। বড়লাট ইঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া যে সূক্ষ্ম রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে ও ভারত-সচিব রাইট অনারেবল মিঃ মণ্টেগুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমার স্বাস্থ্য এরূপ ভগ্ন যে, সভার শেষ অবধি আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আপনাদের অনুমত্যনুসারে আমি সভা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আপনারা অন্য একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করুন।”

মৃত্যুর পূর্ব্বে স্যর চন্দ্রমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বাস্থ্য-লাভার্থ দেওঘরে যান, তথায় তিনি দেড় মাস কাল অবস্থান করিয়া-

ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১৯শে জানুয়ারী তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে তাঁহার তন্দ্রাভাব আইসে, তখনও কেহ আশঙ্কা করে নাই যে, তাঁহার মৃত্যু এত শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, কোন গতিকে তাঁহাকে বাড়ীতে আনা হয়। ডাঃ ডি-এন্ রায় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে থাকেন। রাত্রি দুইটার সময় তাঁহার কন্যা তাঁহাকে পথ্য দিতে গিয়া দেখেন যে, তাঁহার নাড়ী লোপ পাইতেছে। রাত্রি ২৷৷০টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াকালে স্যর কে-জি গুপ্ত, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যর আশুতোষ চৌধুরী, স্যর বি-সি মিত্র, মাননীয় রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রায় যোগেশচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর, রায় রাধিকামোহন লাহিড়ী বাহাদুর, মিঃ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মিঃ এ-এন্, চৌধুরী, মিঃ সি-সি ঘোষ, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট গণ্যমান্য উকীল, ব্যারিষ্টার ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী" পত্র তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই—"গত ২০শে জানুয়ারী শেষ রাত্রে স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গজননী একটি মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হারাইয়াছেন। তিনি বড় আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ বিচারক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি পূর্ণ বয়সে বহু সম্মানে বিভূষিত হইয়া মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮০ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভারতবাসীর মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে মাত্র একজন বাঙ্গালার প্রধান বিচারপতির আসনে অস্থায়ীভাবে বসিয়াছিলেন। ২২ বৎসর কাল তিনি হাইকোর্টের জজীয়তী করিয়াছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচারশক্তির প্রভাবে স্বপদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। উকীল, ব্যারিষ্টার, আসামী, ফরিয়াদী সকলেই তাঁহাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তাঁহার নিকট কোন মোকদ্দমা নথিভুক্ত

হইলে মামলাকারীমাত্রই এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইত যে, তাহাদের মোকদ্দমা যোগ্য বিচারকের হাতে পড়িয়াছে। এদিকে জনসাধারণের নিকটও তিনি বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যে নিখিল ভারতীয় সমাজ-সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কায়স্থ সমাজের মধ্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন 'থাক' তুলিয়া দিবার জন্য এবং দক্ষিণ রাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থকে এক করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্যও তিনি মনে প্রাণে প্রার্থনা করিতেন। বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ হইলেও তিনি শ্রীমতী বেসান্তের মুক্তিতে বাঙ্গালীর আনন্দ-জ্ঞাপনের জন্য টাউন হলের সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন। স্বগ্রাম বিক্রমপুরকে তিনি বড় ভালবাসতেন। বিক্রমপুর সম্মিলনী ও পূর্ব্ববঙ্গ ক্লাবের প্রত্যেক অধিবেশনে তিনি যে ভাবে হউক উপস্থিত হইতেনই। তাঁহার মৃত্যুতে যে স্থান শূন্য হইল তাহা শীঘ্র পরিপূর্ণ হইবে না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।"

সোমবার হাইকোর্ট বসিবার পূর্ব্বেই উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী প্রভৃতি প্রধান বিচারপতির কক্ষে সমবেত হইয়া তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। হাইকোর্টের সকল জজও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন বলেন—"গত কল্য স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। আমারা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। এগার বৎসর পূর্ব্বে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং ২২ বৎসর কাল জজীয়তী করেন। এই দীর্ঘ বাইশ বৎসরকাল তিনি হাইকোর্টের অনেক কাজ করিয়া-

ছিলেন। তিনি উকীল ব্যারিষ্টার আমলা—সকলের সহিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেন।"

ব্যারিষ্টারগণের পক্ষ হইতে মিঃ বি চক্রবর্ত্তী বলেন, "১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ২১ বৎসর বয়সে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রাজুয়েট হন। সেই অল্প বয়সেই তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ওকালতীতে বিশেষ পশার-প্রতিপত্তি লাভ করেন। আমি তাঁহার সমক্ষে বহুদিন ব্যারিষ্টারী করিয়াছি এবং তাঁহার বিচার-নৈপুণ্য-দর্শনে প্রীত হইয়াছি। তিনি বিশেষ পরিশ্রমসহকারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং সুবিচার করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। ১৯০৬ সালে তিনি কয়েক মাসের নিমিত্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসনে উপবেশন করেন। ১৯০৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর-গ্রহণের পর হইতে তিনি স্বজাতির সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ণ বয়সেই মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে যে স্থান শূন্য হইয়াছে তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবে না।"

১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের জন্য কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক স্কুল-কলেজের ছুটী দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের যত উকীল-সমিতি আছে তাঁহারা সকলেই রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের নিকট তদীয় পিতৃদেবের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন—"স্যর চন্দ্রমাধবের মৃত্যুতে এই কর্পোরেশন বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।" নবাব সিরাজ-উল্ ইস্লাম প্রস্তাবটির সমর্থন করিয়া বলেন, "আমি ২০ বৎসরের অধিক কাল তাঁহার সহিত হাইকোর্টে জুনিয়র উকীলরূপে

কার্য্য করিয়াছি। হাইকোর্টে তাঁহার প্রভূত পশার ছিল। বিচারপতি হিসাবে তিনি ন্যায়বান্, জনপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা ছিলেন বঙ্গদেশ তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান্ লোকের জন্য গৌরবান্বিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে একজন উজ্জ্বলতম সন্তানের স্থান শূন্য হইয়াছে।"

১৯১৮ সালের ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলর স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বলেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের মৃত্যু-সংবাদ আপনাদিগকে জানাইতেছি। তিনি বহু বৎসর যাবৎ সিনেটের ও 'ফ্যাকালটি অব ল'য়ের প্রধান সদস্য ছিলেন এবং 'ফ্যাকালটি অব ল'যের সভাপতিও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তিনি বিশেষ যত্ন লইতেন এবং বরেণ্য সদস্য হইলেও তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা কখনই শিথিল হয় নাই। শাসনবিভাগে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী, আইনের অধ্যাপকতা, হাইকোর্টে ওকালতী ও জজীয়তী করিয়া তিনি যে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট সম্মানের আসন প্রদান করিয়াছিল। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার সংস্কারেও তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।"

৯১৮ সালের ৩রা এপ্রিল বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসের সভাপতিত্বে ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে কলিকাতার নাগরিকগণের একটি বিরাট শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড রোণাল্ডসে সেই সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

"আজ আমরা স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উপায়-বিধানের জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি। ইনি ৮০ বৎসর বয়সে অনেক কার্য্য করিয়া মারা গিয়াছেন। আমি বাঙ্গালায় আসিয়া গভর্ণরী গ্রহণ করিবার পর তিনি আসিয়া আমাকে অভিনন্দিত

করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সহিত আমার প্রথম ও শেষ দেখা। কিন্তু তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে না জানিলেও অনেক লোকের জীবনের উপর যে তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা মনীষী তাঁহাদের জীবন জনসাধারণের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। চন্দ্রমাধব যে একজন আদর্শস্থানীয় পুরুষ ছিলেন, এ বিষয়ে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই। মনীষাবলে তিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, তিনি উকীল-হিসাবে, বিচারক-হিসাবেও যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভদ্রতা ও সৌজন্যেও সেইরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে না থাকিলেও তাঁহার স্মৃতি রহিয়াছে।" সভায় তিনটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাননীয় বিচারপতি মিঃ গ্রীভ্‌স্—যথাক্রমে প্রস্তাব তিনটি উত্থাপন করেন। প্রথম প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, এই সভা স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন। প্রস্তাবটী উত্থাপন-প্রসঙ্গে স্যর গুরুদাস বলেন, "স্যর চন্দ্রমাধব ঊনবিংশ শতাব্দীতে যত মহৎ লোক বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া অতি সম্মানজনক উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। স্যর চন্দ্রমাধব যখন আইনের অধ্যাপক তখন আমি ছাত্র, সেই সময় চন্দ্রমাধবের সহিত আমার পরিচয় হয়। সে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা।"

স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই যে, জনসাধারণের চাঁদায় স্যর চন্দ্রমাধবের যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষা করিতে হইবে। প্রস্তাবটি উত্থাপন-প্রসঙ্গে স্যর সুরেন্দ্রনাথ

তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার সহিত বলেন, "যদি আপনারা সত্য সত্যই মনে করেন যে, স্যর চন্দ্রমাধবের জীবনের অনুসরণ দ্বারা দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হইবে তাহা হইলে তাঁহার যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষা করা প্রয়োজন। আমি চিরকালই বীরত্বের উপাসক। যে জাতি নিজের মহৎ লোকের সমাদর করিতে পারে না, সে জাতির মধ্যে কখনও মহৎ লোক জন্মে না। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে জীবিতেরও আবার সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতে ইচ্ছা হয়। অনেক সৈনিককে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' দিয়া পুরস্কৃত করা হইয়াছে। ইহার কি কোন উপযোগিতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। ইহাতে জীবিতের প্রাণে মৃতের বীরত্বের আদর্শ অনুসরণ করিবার আগ্রহ জন্মে। প্যারিসে বীরপূজার জন্য একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে কোন্ ফরাসীর প্রাণে বীরত্বের ও শ্লাঘার উদয় না হয়? ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবির নিকট দিয়া যাইবার সময় কোন্ ইংলণ্ডবাসীর প্রাণে জাতি-গৌরব জাগিয়া না উঠে? আমরা কি তদ্রূপ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু রমেশচন্দ্র মিত্র ও স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতি নবভারতের স্রষ্টাগণের প্রতিমূর্ত্তি রাখিতে পারি না? এই মন্দিরকে ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ তীর্থস্থান বলিয়া মনে করিবে এবং এই মন্দিরের সংস্পর্শে আসিয়া সত্য স্বাধীনতা ও দেশ-প্রীতিতে তাহারা উদ্বুদ্ধ হইবে। স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের জীবনী ও আদর্শ চিরস্থায়ী রাখার যোগ্য। বিচারক, সমাজ-সংস্কারক ও স্বদেশ-সেবক হিসাবে তিনি জাতির সম্মুখে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে বজ্রের ন্যায় কঠোরতা এবং নারীর ন্যায় মাধুর্য্য ছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা-বলে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে হাইকোর্টের প্রধান

বিচারপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ কেবল সরকারী চাকুরে ছিলেন না। তিনি স্বসমাজ ও দেশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি সারদাচরণ মিত্রের সহিত একযোগে বিভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বিবাহ চালাইয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস লিখিত হইবে তখন তন্মধ্যে স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষের স্থান অতি উচ্চে বসিবে। আমাদের পিতৃ-পিতামহ হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহার ক্ষেত্র আমরা বাড়াইতে চাই। স্তর চন্দ্রমাধব তাঁহার জীবনে এমন কিছু করিয়া গিয়াছেন যে জন্য আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে চাই। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে গেলে টাকার দরকার। আমি জনসাধারণের নিকট টাকার জন্য চাঁদা চাহিতেছি। যদি আমরা এজন্য অর্থ না দিই এবং বক্তৃতা করিয়াই কর্ত্তব্য সমাধা করি, তাহা হইলে সেই মৃত মহাপুরুষের স্মৃতির প্রতি অবমাননা করা হইবে।

বিচারপতি মাননীয় মিষ্টার গ্রীভস্ তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া স্তর চন্দ্রমাধবের গুণগান করেন।

স্তর চন্দ্রমাধবের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, স্বদেশের কল্যাণ-চিকীর্ষু ব্যক্তির আবির্ভাব দেশে যত অধিক হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর স্তর চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রথম নির্ব্বাচিত সদস্য ও সিণ্ডিকেটের সভ্য, কলিকাতা কর্পোরেসনের ভূতপূর্ব্ব সদস্য, পুরাতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং

প্রথম দ্বৈতশাসনের আমলের সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

স্যর শ্যামশুল হুদা তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "এই দরিদ্র দেশের জন্য যোগেন্দ্রচন্দ্র যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।"

যখন তিনি কলেজের ছাত্র মাত্র, তখন তিনি শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজে তথায় শিক্ষা দান করিতেন। অতঃপর তিনি আসামে যাহাতে কুলী চালান দিতে না পারা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক বড় বড় ষ্টেশনে নিজের অর্থ দিয়া লোক নিযুক্ত করেন এবং জাতীয় মহাসমিতিতে এইপ্রকার আইনসঙ্গত ক্রীতদাস-প্রথা তুলিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। গভর্ণমেণ্ট তদবধি কুলী-রপ্তানি আইনের (Emigration Law) পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ঐ নিষ্ঠুর প্রথা এখন একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। সিনেটের সদস্যপদে থাকা-কালীন বি-এসসি ডিগ্রী দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিষয়ে রায় বাহাদুর যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া ছিলেন। শারীরিক ব্যায়াম-চর্চ্চা বিদ্যালয়ে তিনি বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সিনেটে প্রস্তাব উত্থাপন করিলে দুর্ভাগ্যক্রমে একটি ভোটে তিনি পরাজিত হন।

সহরতলীতে কলিকাতায় কয়েকটি বড় বড় রাস্তা ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী তাঁহারই চেষ্টায় খনিত হইয়াছিল। স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে ভৎর্সনামূলক প্রস্তাব সমর্থন করা সত্ত্বেও স্যর আলেকজাণ্ডার তাঁহাকে একখানি সম্মানসূচক সার্টিফিকেট দিয়া-ছিলেন। স্যর আলেকজাণ্ডার অত্যাচারমূলক মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তন করিলে তিনি প্রতিবাদস্বরূপ কর্পোরেশনের সদস্যপদে ইস্তফা প্রদান করেন। সুখের বিষয়, নূতন ব্যবস্থাপক সভায় সেই মিউনিসিপ্যাল আইন রদ করা হইয়াছে।

ভারতবাসীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের জন্য যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং যে সমিতি হইতে এ যাবৎ প্রায় চারিশত ছাত্রকে বিদেশে শিক্ষালাভার্থ পাঠান হইয়াছে. সেই সমিতির তিনি স্থাপয়িতা ও সম্পাদক। তাঁহার ছাত্রগণ ২০টি নূতন শিল্পের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় ১২ জন ডি-এস সি ও পি-এইচ ডি, ৩০ জন এম্-এস্ সি, ১০০শত জন বি-এস সি লণ্ডন, এডিনবার্গ, ম্যাঞ্চেষ্টার বার্ম্মিংহাম, লীডস বার্লিন, প্যারিস, ব্যাসল, কর্ণেল, মিচিগান, ওহিও, কালিফোর্নিয়া, হার্ভার্ড, ইলিয়নিস্. টোকিও প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া ভারতের বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপকতা করিতেছেন। বিদেশের শিল্পবিজ্ঞান শিখাইয়া এদেশবাসীকে ও এদেশকে উন্নতির অভিমুখে লইবার জন্য তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা-দর্শনে 'নব্যভারত' পত্র তাঁহাকে বাঙ্গালার " মকাডো " বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজের তদানীন্তন নেতা স্বর্গীয় রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় ও মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লিখিয়াছিলেন যে. বিজ্ঞান সমিতির পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বিদেশে পাঠাইয়া যোগেন্দ্রচন্দ্র সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে যে সামাজিক আপত্তি ছিল তাহা অপসারিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপরোক্ত কার্যসমূহ তাঁহার বাহ্যিক কার্য্যমাত্র। তিনি একজন মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত, গ্রন্থকার, দার্শনিক ও ধর্ম্মশিক্ষক। ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরা চিরদিন তাঁহার নাম মনীষী-হিসাবে স্মরণ করিবে। "হিন্দু আইন" সম্বন্ধে তিনি যে তিন খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে হিন্দু আইনের অনেক বিষয় পরিষ্কার-রূপে বুঝান হইয়াছে। প্রিভি কাউন্সিলের একজন বিচক্ষণ বিচারপতি তাঁহার এই হিন্দু আইনের ভূয়সী প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত

গ্রন্থ ও টীকা-সমূহের তিনি যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় কীর্ত্তি। সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" পত্র এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—Will last as long as Hindu Law and the Sanskrit language will last। অবিভাজ্য সম্পত্তি ও দান সম্বন্ধে তিনি ঠাকুর অধ্যাপক-হিসাবে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার অতুল পাণ্ডিত্য ও গবেষণাশক্তির পরিচায়ক।

প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণামূলক পুস্তকখানি এত সুন্দর হইয়াছে যে, জনৈক ইউরোপীয় অধ্যাপক সে সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"This book is the outcome of long reflection and a grand reflections." এরূপ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জীবনী এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

সরকারী সদস্য ও মন্ত্রীদলের বাধা সত্ত্বেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার প্রতি থানায়, ইউনিয়নে, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও পল্লীগ্রামে জল সরবরাহের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় কত লক্ষ দরিদ্র বঙ্গবাসীর যে উপকার হইতেছে তাহার আর সংখ্যা নাই। বাঙ্গালার শিশুরক্ষা আইন পাশ করাইয়া তিনি বহু সহস্র হতভাগিনী বালিকার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের স্বার্থরক্ষা-কল্পে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল তিনি তাহার সমর্থন করিয়াছিলেন এবং এজন্য তিনি একাধিকবার সরকারের ধন্যবাদ লাভ করিয়াছিলেন। শাসন-পরিষদের জনৈক সদস্য একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কাউন্সিলের একজন নিঃস্বার্থ সদস্য একবার তিনি "জিদ" এই কথাটি প্রত্যাহার করিতে বারংবার অনুরুদ্ধ হইলেও তাহা প্রত্যাহার না করিয়া সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রীদিগের অত্যধিক বেতন, সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন, গোহত্যা-সম্বন্ধীয় আইন, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের পরিবর্ত্তন প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ করায় তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ও তথাকথিত উদার-নীতিক সদস্যদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। চরমপন্থীদের অনেক মতের সমর্থন না করায় তিনি তাঁহাদেরও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় তিনি যে বিশেষ তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী সদস্য ছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য।

ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার বক্তৃতাসমূহ বাগ্মিতার পরিচায়ক এবং রাজনীতিক তথ্যে পরিপূর্ণ। যাঁহারা রাজনীতি-সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদেরই উহা পাঠ করা উচিত। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের আটটী পুত্র ও তিনটি কন্যা।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ

সতীশবাবু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু স্কুলে পাঠ করিয়া তার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ করেন। অতঃপর বি-এল পাশ করিয়া তিনি উকীল হন। ১৯২১ ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় জমিদার-সভার প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হন। তিনি ১৭নং ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকা জেলার মালখানগরের স্বর্গীয় বামাচরণ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বিমলচন্দ্র ঘোষ ও কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার ঘোষ। বিমল বাবু মিঃ বি-সি ঘোষ নামে পরিচিত; ইনি হাইকোর্টের সুপরিচিত ব্যারিষ্টার।

তিনি হুগলীর জমিদার স্বর্গীয় বিপিনবিহারী মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন।

কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়কুমার কলিকাতা (ছোট আদালতের উকীল)। তিনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বৈদ্যনাথ দত্তের পৌত্রীকে বিবাহ করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। কাঁসারীপাড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রথমে অধ্যয়ন করিয়া তিনি হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্-এ পাশ করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এটর্নী বি-বি রটন সাহেবের ফার্ম্মে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এটর্নীগিরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী দশ বৎসরকাল বি-বি রটনের ফার্ম্মে কাজ করিবার পর তিনি প্রথমে ৮নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে নিজস্ব ফার্ম্ম খুলেন, তথা হইতে ১০নং ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে ফার্ম্ম স্থানান্তরিত হয়। তিনি ১৭নং ওয়ার্ড হইতে দশ বৎসর কাল মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রায় বাহাদুর রাধাচরণ পালের মৃত্যু হইলে তিনি ই জি পি কমিটির প্রেসিডেণ্ট, জেনারেল কমিটি, বিল্ডিং কমিটি, মার্কেট কমিটি ও বস্তী ইম্প্রুভমেণ্ট কমিটির সদস্য হন। ১৯২৩ সালে তিনি বঙ্গীয় জমিদার-সভার প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং তিনি বৎসরকাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দিল্লী ইউনিভার্সিটি কোর্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং ফ্যাইন্যান্স কমিটী, রেলওয়ে পরামর্শ বোর্ড, বিবাহ

সম্মতি কমিটি, হিন্দু দেবোত্তর কমিটি, বার কাউন্সিল, আদালত অবমাননা কমিটি প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় জমিদার-সভার সদস্য ছিলেন। তিনি বরিশাল জেলার কাঁচাবেলিয়া-নিবাসী স্বর্গায় ভারতচন্দ্র গুহের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত অরুণকুমার ঘোষ, ইনি ব্যারিষ্টার; মধ্যমের নাম শ্রীযুক্ত তরুণ কুমার ঘোষ, ইনি ইঞ্জিনিয়ার এবং কনিষ্ঠের নাম ৺অমিয়কুমার ঘোষ।